দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

ভারতবোধ ও প্রকৃতি সংরক্ষণ এক সূত্রে আবদ্ধ— পৃঃ ২৬

জলসংকট বিশ্ববাসীর কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে — পৃঃ ৩৫

৭৭ বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা।। ২ জুন, ২০২৫।। ১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২।। যুগাব্দ - ৫১২৭।। website : www.eswastika.com

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৭ বর্ষ ৩৯ সংখ্যা, ১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

২ জুন - ২০২৫, যুগাব্দ - ৫১২৭,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

মমতার ছকের প্রতিনিধি অভিষেক কি ভারতের প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে যোগ্য? ‘ম’-তে লক্ষ্মণরেখা টানতেই হবে

◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

বড্ড বাড় বেড়েছে বাংলাদেশ ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

‘সিঁদুর’-এর বর্ণে তথাকথিত নারীবাদীদের গাত্রদাহ

◻ সোনালি মিশ্রা ◻ ৮

আগামীদিনে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিকে কীভাবে সাজানো সম্ভব? ◻ কৌটিল্য ◻ ১০

বালোচরা কোনো দিনই পাকিস্তানভুক্ত হতে চায়নি

◻ দুর্গাপদ ঘোষ ◻ ১১

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দৃষ্টিতে ‘বর্তমান হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা’ ◻ ড. চন্দ্রশেখর মণ্ডল ◻ ১৪

ইউনুসের নেতৃত্বে বাংলাদেশ জেহাদি দেশে পরিণত হতে চলেছে ◻ ১৭

প্লাস্টিক—পরিবেশ রক্ষার ভয়ংকর বিপদ

◻ অনিকেত বৈশ্য ◻ ২৩

প্রকৃতি রক্ষতি রক্ষিতঃ ◻ সোমকান্তি দাস ◻ ২৪

জীবজগৎ রক্ষায় পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ হলো একমাত্র বিকল্প ◻ অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায় ◻ ২৫

ভারতবোধ ও প্রকৃতি সংরক্ষণ এক সূত্রে আবদ্ধ

◻ ড. রাজলক্ষ্মী বসু ◻ ২৬

হিন্দু সাম্রাজ্য দিনোৎসব—বর্তমান প্রেক্ষাপট

◻ ডাঃ শিবাজী ভট্টাচার্য ◻ ৩১

দু’হাজার বছরের প্রাচীন হাওড়া শিবপুরের বেতাই চণ্ডী মন্দির

◻ অদিতি চক্রবর্তী ◻ ৩৩

জলসংকট বিশ্ববাসীর কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে

◻ হীরক কর ◻ ৩৫

সাক্ষাৎকার—ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজের সংরক্ষণ করে রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীণ বিকাশই সঙ্ঘের লক্ষ্য : ডাঃ মোহনরাও ভাগবত

◻ ৪৩

গল্পকথায় ডাক্তারজী ◻ সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস ◻ ৫০

নিয়মিত বিভাগ :

◻ চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ সমাবেশ সমাচার : ২৮-৩০ ◻ অন্যরকম : ৩৯ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻

প্রকাশিত হবে ৯ জুন ২০২৫

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে ৯ জুন ২০২৫

মাওবাদীমুক্ত ভারত

বিদেশি মতাদর্শপুষ্ট মাওবাদীরা অস্থিরতা সৃষ্টি করে ভারতকে দুর্বল করে দিতে চায়। এই লক্ষ্যে তারা সমান্তরাল শাসনব্যবস্থা কায়েম করার চেষ্টা করছে। খুন-জখমের মধ্যে দিয়ে সরকারি শাসনতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য সহজ সরল জনজাতিদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। বিদেশি অর্থে বলীয়ান এই মাওবাদই এখন দেশের সামনে বড়ো চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার মাওবাদীমুক্ত ভারত গড়ার সংকল্প নিয়ে শক্ত হাতে সেই চ্যালেঞ্জের কীভাবে মোকাবিলা করার কাজে নেমে পড়েছে— স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই বিষয়েই আলোকপাত করবেন কয়েকজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name : **INDIAN OVERSEAS BANK**

Branch : **Sreemani Market Kolkata-700 006**

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০ টাকা (মোট ২৮০০) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

পরিবেশ সংরক্ষণ এবং ভারতীয় সংস্কৃতি

বিশ্ব জুড়িয়া প্রশ্ন উঠিয়াছে, এই পৃথিবী মানুষের বাসযোগ্য থাকিবে কিনা? সত্য কথা হইল, মানুষেরই কাণ্ডজ্ঞানহীন কর্মকাণ্ডে এই প্রশ্নের উদ্ভব হইয়াছে। মানুষ ভোগসর্বস্ব জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া প্রকৃতিকে শোষণ করিবার খেলায় মাতিয়াছে, তাহাতে এই পৃথিবী পরিবেশের ভারসাম্য হারাইয়া প্রবল দূষণের কবলে পড়িয়াছে। তাহার ফলে ওজোনস্তরের ক্ষয়, বায়ুবাহিত রোগ-ব্যাধি, অ্যাসিড বৃষ্টি, সমুদ্র-নদী-জলাশয়ে প্রবল দূষণ প্রভৃতি বিশ্ব জুড়িয়া ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছে। এককথায় পরিবেশ দূষণ এই একবিংশ শতাব্দীর গুরুত্বপূর্ণ বিপদে পরিণত হইয়াছে। তাহারই ফলশ্রুতিতে ১৯৭২ সালে ৫ হইতে ১৬ জুন সমগ্র বিশ্বের পরিবেশ বিজ্ঞানীগণ ইউনাইটেড নেশনস কনফারেন্স অন দ্য হিউম্যান এনভায়রনমেন্ট-এ সম্মিলিত হইয়াছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, প্রতি বৎসর ৫ জুন তারিখটিকে পরিবেশ রক্ষার্থে বিশ্বব্যাপী জনসচেতনতা ও কর্মোদ্যোগ গ্রহণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা। পর বৎসর হইতেই দিনটি বিশ্ব পরিবেশ দিবস রূপে পালিত হইয়া আসিতেছে। প্রতি বৎসরই বিশ্বের পৃথক পৃথক শহরে পৃথক পৃথক প্রতিপাদ্য বিষয় লইয়া দিনটি উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে। তাহা সত্ত্বেও মানুষের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা তেমনভাবে আগ্রহ সৃষ্টি করিতে পারে নাই। পরিবেশ রক্ষার নামে তাহা একটি উৎসব দিবসে পর্যবসিত হইয়াছে। ভারতীয় সংস্কৃতিতে শুধুমাত্র একটি দিবস নহে, নিত্যদিনের আচরণে পরিবেশ সচেতনতার কথা বলা হইয়াছে। কেননা ভারতীয় সংস্কৃতিতে এই পৃথিবীকে ঈশ্বরের প্রতিরূপ এবং প্রকৃতিকে সমাজজীবনের অভিন্ন অঙ্গ মনে করা হইয়াছে। তাই ভারতীয়গণ এই পৃথিবীকে পৃথ্বীমাতা, ধরিত্রীমাতা বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন। শুধু তাহাই নহে, এই পৃথিবীর নিকট হইতে জীবন ধারণের নিমিত্ত যাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহাতেই দেবত্ব আরোপ করিয়াছেন। হিন্দুগণ এই পৃথিবীর প্রতিটি কণায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করিয়াছেন। বেদগ্রন্থ হিন্দুজাতিকে শিক্ষা দিয়াছে, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। অথর্ববেদ শিক্ষা দিয়াছে, মাতা ভূমি পুত্রোহহম্ পৃথিব্যা। অর্থাৎ এই পৃথিবী হইলেন মাতা, আর আমি তাঁহার পুত্র। এই মাতা-পুত্রের সম্পর্কের কারণে হিন্দুরা প্রকৃতিকে শোষণ করেন না, দোহন করিয়া থাকেন। বেদ-উপনিষদ-পুরাণ, রামায়ণ-মহাভারত সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থে পরিবেশকে রক্ষা করিবার কথা বলা হইয়াছে। বেদ-উপনিষদে জলকে যেমন 'জীবন' বলা হইয়াছে, তেমনই বৃক্ষকেও 'প্রাণ' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ঋকবেদের একটি সূক্তে বলা হইয়াছে, বৃক্ষের পূজা করিলে সমগ্র সৃষ্টির পূজা সাধিত হইয়া থাকে। যজুর্বেদে জল সংরক্ষণ এবং জলকে দূষিত না করিবার উল্লেখ রহিয়াছে। হিন্দু সংস্কৃতির ছত্রে ছত্রে পবিবেশ সংরক্ষণ ও সংবর্ধন করিবার নির্দেশ রহিয়াছে।

ভারতীয় সভ্যতার মূলে রহিয়াছে আরণ্যক জীবন। ইহার মূল ভিত্তি হইল মনুষ্য ও পরিবেশের সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখা। হিন্দুরা মনে করিয়া থাকেন, এই বিশ্বপ্রকৃতি ঈশ্বরেরই প্রতিরূপ। সেই কারণেই আমাদিগের পূর্বপুরুষগণ প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় সর্বদা রক্ষকের ভূমিকা পালন করিয়াছেন। পাঁচহাজার বৎসর পূর্বের হরপ্পা সভ্যতায়ও তাহার নিদর্শন মিলিয়াছে। কৌটিল্যনীতিতে জলকে সমষ্টিগত পণ্য বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহা ব্যক্তিগত পণ্যে পরিণত করিলে মানবজাতির উপর ভয়াবহ অভিশাপ বর্ষিত হইবে বলিয়া সাবধানবাণী উচ্চারিত হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও সমষ্টিগত এই পণ্যকে ব্যক্তিগত পণ্যে পরিণত করিয়া একশ্রেণীর মানুষ কোটি কোটি টাকার ব্যবসায় করিয়া চলিয়াছেন। সুখের বিষয় হইল, পরিবেশ রক্ষার সংকল্প ও সচেতনতা এখন শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তকেই সীমাবদ্ধ না রাখিয়া ভারতীয় সংস্কৃতি অনুসারে প্রতিটি দিবসই সক্রিয় থাকিবার কথা বলা হইতেছে। বিশ্ব পরিবেশ দিবসে নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন ও সচেতনতা গড়িয়া তুলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবার কথা বলা হইতেছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ তাহাদের শতবর্ষের যাত্রাপথে সমাজ পরিবর্তনে পঞ্চ পরিবর্তনের কর্মসূচি গ্রহণ করিয়াছে। তাহারই একটি হইল পর্যাবরণ অর্থাৎ পরিবেশ সচেতনতা। তাহারা পরিবেশ রক্ষার নিমিত্ত বৃক্ষরোপণ, জল সংরক্ষণ, প্লাস্টিক বর্জন প্রভৃতি যাবতীয় কর্মসূচি নিজেদের আচরণে আনয়ন করিয়া পরবর্তী বৎসর সমগ্র সমাজকে উদ্বুদ্ধ করিবেন। পরিবেশ রক্ষার কথা ভারতবর্ষ বিশ্ববাসীকে বলিয়াছে, আজ এতদিন পর তাহারা তাহাতে সহমত পোষণ করিয়াছে, ইহা একটি শুভ লক্ষণ।

সুভাষিতম্

বায়ূনাং শোধকাঃ বৃক্ষাঃ রোগণাপহারকাঃ
তস্মাদ্ রোপণমেতেষাং রক্ষণং চ হিতাবহম্।।

বৃক্ষ বায়ু শোধন করে থাকে এবং রোগ-ব্যাধি দূর করতে সহযোগিতা করে। এজন্য বৃক্ষ রোপণ এবং তার রক্ষণাবেক্ষণ প্রাণীমাত্রেই হিতকারক।

মমতার ছকের প্রতিনিধি অভিষেক কি ভারতের প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে যোগ্য?

‘ম’-তে লক্ষ্মণরেখা টানতেই হবে

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

চতুর রাজনীতিক হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্য অনৈতিক কাজকে নৈতিক হিসেবে তুলে ধরা। সন্ত্রাসবিরোধী ভারতীয় প্রতিনিধি দলে তৃণমূল দলের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্তর্ভুক্তি তার বড়ো উদাহরণ। তাতে সাপও মরল আর লাঠিও ভাঙল না। মমতা প্রমাণ করলেন অভিষেককে ঘিরে জনমানসে যে নেতিবাচক ধারণা রয়েছে তা ভুয়ো। ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে তৃণমূল দল থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নির্বাচনের বিষয়ে তিনি গোঁ ধরে থাকেন। অন্য বা একাধিক নাম দেওয়ার পরিবর্তে নানা টালবাহানার পর এই একটি নামের প্রসঙ্গেই তিনি স্থির থাকেন। তাঁর পছন্দের এই একমাত্র সাংসদটি প্রতিনিধি দলের সদস্য না হলে প্রতিনিধি দলের জন্য তৃণমূল আর কাউকে মনোনীত করবে না, এই প্রতিনিধি দল থেকে সরে দাঁড়াবে বলেও জানিয়ে দেন। তৃণমূলে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুখেন্দুশেখর রায়, ডেরেক ও' ব্রায়েন, সাগরিকা ঘোষ, এমনকী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বলিয়ে কইয়ে নেতা থাকা সত্ত্বেও অভিষেককেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি হিসেবে বাছলেন এবং সেই সঙ্গে প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন যে চার্জশিট-সহ অভিষেকের বিরুদ্ধে যত অভিযোগ রয়েছে তার সবই অর্থহীন।

বিজেপি ও তৃণমূলের ‘সেটিং তত্ত্ব’ বেচে খাওয়া বামপন্থী ও কংগ্রেসও তাতে বোকা বনে গিয়েছে। দিল্লিতে তৃণমূলের ইন্ডি জোটসঙ্গী এবং পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক বিরোধী এই দলগুলির কেউ বিরোধিতার টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করেনি। ২০১২ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রণব মুখোপাধ্যায়ের জন্য বিদেশি বামেদের ভোট মমতা এইভাবেই জোগাড় করে দিয়েছিলেন। পাক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিশ্বকে বার্তা দিতে বিভিন্ন দেশে ভারতের পাঠানো ‘অল-পার্টি এমপি ডেলিগেশন’ বা সব দলের সাংসদদের নিয়ে গঠিত প্রতিনিধি দলের ৫৯ জন প্রতিনিধির মধ্যে কেবল অভিষেকের বিরুদ্ধেই টাটকা অভিযোগ রয়েছে। দেশের প্রতিনিধি হিসেবে অভিষেককে তুলে ধরে মমতা যেমন তার উত্তরসূরী সুনিশ্চিত করলেন, তেমনই বোঝালেন অভিষেক ধোয়া তুলসীপাতা। তার বিরুদ্ধে সব অভিযোগ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। মমতার এই ছলচাতুরী আগামী বছর রাজ্য বিধানসভা ভোটে তাকে কী সুফল দেবে সেটাই দেখার।

তবে এটা ঠিক যে, এরপর অভিষেককে কোনো বেআইনি কাজের অভিযোগে আটক করা তদন্তকারী সংস্থাদের পক্ষে হয়তো একটু কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। সেক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে আনা সমস্ত অভিযোগ সত্য হলেও তা সাজানো বলেই অপপ্রচার চালাবে তৃণমূল। বিজেপি নেতৃত্বের বক্তব্য হতে পারে যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবিত নামটি গ্রহণ করে গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিকভাবে সঠিক কাজই করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। অভিষেকের প্রতিনিধিত্বে কোনো আপত্তি না করে, গণতান্ত্রিক রীতিনীতি বহাল রেখে রাজনৈতিক সৌজন্যের পরিচয় দিয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন ভারত সরকার। কারণ এরপর সরাসরি প্রধানমন্ত্রী-বিরোধী কিছু বলতে গেলে অভিষেককে অস্বস্তিতে পড়তে হবে। তার থোঁতা মুখ ভোঁতা হবে।

দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না। রাজ্যের চারিদিকে জঙ্গি ভরে দেওয়ার পর মমতা এখন বলছেন যে, লক্ষ্মণরেখা টানতে হবে। অথচ ‘ম’-তে মুসলমান, মমতা, মুর্শিদাবাদ ও মৃত্যু সমার্থক হয়ে গিয়েছে। এই চার ‘ম’ বা গ্যাং অফ ফোর (চারচক্র)-এর বিরোধী প্রমাণটিই হলো ‘অপারেশন সিঁদুর’। বৈসরন থেকে বেতবোনা পর্যন্ত যে হিন্দুবিরোধী সন্ত্রাস ভারতের মানুষ দেখেছেন, মুর্শিদাবাদ সংক্রান্ত কলকাতা হাইকোর্টের এসআইটি (সিট) রিপোর্ট তা আরও বেশি করে প্রমাণ করেছে। এই রিপোর্ট দেখিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসন কতটা নির্লজ্জভাবে হিন্দুবিরোধী। সিপিএম আর কংগ্রেস সেই হিন্দুবিরোধী গাছে জল ঢালে। মুর্শিদাবাদের ঘটনা দেখিয়েছে কারা এই রাজ্যে ইসলামি সন্ত্রাসের দোসর। রাজ্যের মানুষ জানে যে, শওকত ও জাহাঙ্গিরের মতো জেহাদিরা কার ছায়াসঙ্গী। তারপরেও তৃণমূলের সাংসদ অভিষেকবাবুকে ইসলামি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বলতে দেশের প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে পাঠানোর ব্যাপারে অবস্থান নেয় তৃণমূল। এর চাইতে হাস্যকর ও মশকরার আর কী থাকতে পারে? মুর্শিদাবাদে হিন্দু নিধন যজ্ঞে রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক সন্ত্রাসের প্রধান কারিগর তৃণমূল নেতা আর তাদের প্রশাসন। অভিষেকবাবুর মতো নানা অপরাধে অভিযুক্ত এবং একজন বিতর্কিত চরিত্র যেভাবে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেলেন তা কতটা সঙ্গত তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই জনমানসে প্রশ্ন উঠেছে। অনেকের কাছে তা হতাশা ও বেদনারও বটে। তৃণমূলের অন্দরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে যে, পুরো নাটকটাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ক্রিপ্টেড বা লিখিত। অভিষেককে সামনে নিয়ে আসার জন্য সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ইউসুফ পাঠানকে ঘিরে মমতা নাটুকেপনা করেছিলেন। সবশেষে অভিষেকের নামটাই দেন। কারণ অভিষেকের নামটাই তিনি প্রথম থেকে ঠিক করে রেখেছিলেন।

যে চার ‘ম’-এর সমাহার পশ্চিমবঙ্গে ঘটেছে, তার ইতি টানার সময় আগত। ‘ম’-এর মরণফাঁদে যেমন পড়েছে রাজ্য, তেমনই পড়েছে এখানকার হিন্দুরা। এই রাজ্যের হিন্দুরা এই মুহূর্তে যে অস্তিত্বের সংকটে ভুগছে, সেই সংকটের মেঘ সরাতে গেলে ওই চার ‘ম’-এর উপর লক্ষ্মণরেখা টানতেই হবে। কালিঝুলি মাখা তিন বারের সাংসদ পাকিস্তান বা বিশ্বকে কী বার্তা দেবে তা বলা কঠিন! ২০২৬-এর ভোটে এই রাজ্যের চার ‘ম’-এর উপর লক্ষ্মণরেখা টানতে না পারলে এখানকার হিন্দুদের অনস্তিত্বের অস্তিত্ব হিসেবেই থেকে যেতে হবে। অনেক জেলায় তারা হতে পারে অস্তিত্বহীন। আর তা মোটেও সুখের হবে না।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

২০২৬-এর ভোটে এই রাজ্যের চার ‘ম’-এর উপর লক্ষ্মণরেখা টানতে না পারলে এখানকার হিন্দুদের অনস্তিত্বের অস্তিত্ব হিসেবেই থেকে যেতে হবে।

বড্ড বাড় বেড়েছে বাংলাদেশ

ইউনুসবান্ধবেষু দিদি,

একটা প্রবাদ আছে। 'যার খায় যার পরে, তারই আবার ক্ষতি করে'। এটা আপনাকে বলছি, কারণ আপনার সঙ্গে বাংলাদেশের বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের মিল রয়েছে। প্রথমত দুই সরকারই ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধী। অথচ দু'জনেই কেন্দ্রের দয়ায় অনেক কিছু করতে পারে। মানে উন্নয়নমূলক কাজ আর কি! দ্বিতীয়ত, দু'জনেই বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়াতে চায়। এই আপনি যেমন দুর্নীতির জন্য কেন্দ্র যে সব প্রকল্পের টাকা আটকে রেখেছে সেগুলি নিজেই করতে চান। অথচ রাজ্যের নিজের খরচ চালানোর পয়সাই নেই। একইভাবে নিজের দেশ ঠিক মতো চালাতে না পারা ইউনুস ভারতকে অসুবিধায় ফেলতে চাইছেন। তবে চাপে পড়ে ইউনুস ইতিমধ্যেই বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি পালাতে পারলে বাঁচেন। এনিয়েই আজকের আলোচনা। দেখুন।

সদ্যই পাকিস্তানকে যোগ্য জবাব দিয়ে টগবগ করছে ভারতীয় সেনা। ওদিকে ভারতীয় কূটনীতির যে সাফল্য দেখা গিয়েছে তাতে উচ্ছ্বসিত ভারত সরকারও। এই পরিস্থিতিতে এবার বাংলাদেশকে শিক্ষা দেওয়ার পালা। ইতিমধ্যেই ভারতের পদক্ষেপে কাঁপছে ইউনুস প্রশাসন। এবার কাঁদবেন দিদি আপনি। আমরা কাছে থাকি বলে সেই কান্না সবার আগে শুনতে পাব। হাতেপায়ে ধরতে হবে। তার আগে নিজের থেকেই পদত্যাগ করতে চাইছেন ইউনুস।

দিদি, পাকিস্তানের কান্না আপনি দেখেছেন। পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ দেশের সেনার এক জমায়েতে বলছেন, ৯ ও ১০ মে-র মধ্য রাতে, প্রায় আড়াইটা নাগাদ সেনাপ্রধান মুনিরের ফোন আসে। হট লাইনে বলে, বস, ভারত মেরে ফাটিয়ে দিয়েছে। নুর খানে মিসাইল মেরেছে। পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের মেয়ে, মরিয়ম শরিফ সারগোধা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অনুষ্ঠানে বক্তৃতায় বলছেন, ভারত পাকিস্তানের চরম ক্ষতি করে দিয়েছে। আবার পাক সেনেটের সৈয়দ আলি জাফর পাকিস্তান সেনেটে দাঁড়িয়ে সাঙ্ঘাতিক কথা বলছেন। বলছেন, সিন্ধু চুক্তি স্থগিত করে দিয়ে ভারত আসলে পাকিস্তানের ওপর 'ওয়াটার বম্ব' ফেলেছে। পকিস্তানের উচিত যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভারতের পায়ে পড়া।

একই দশা বাংলাদেশের। মহম্মদ ইউনুস বুঝেছেন, আর পারা যাবে না। দেশে নির্বাচন করা নিয়ে নানা মত, জামাতের সঙ্গে তাল রেখে চলা, সেনার কথা শোনা সব কিছু করা যায় কিন্তু ভারত যদি বেঁকে বসে তবে দেশ চলবে না। ইতিমধ্যেই ব্যবসাবাণিজ্যের হাল খারাপ। ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রক বিবৃতি জারি করেছে কোনো স্থলবন্দর দিয়ে বাংলাদেশের রেডিমেড পোশাক ভারতে ঢুকবে না। কেবল মুম্বই ও কলকাতা বন্দর দিয়ে জলপথে ঢুকতে পারবে। ফল, ফলের স্বাদযুক্ত কার্বনেটেড পানীয়, কেক, চিপস্, বিস্কুট, তুলো, সুতো, প্লাস্টিকের পণ্য এবং কাঠের আসবাবপত্র অসম, মেঘালয়, ত্রিপুরা বা মিজোরামের কোনো স্থল সীমান্ত দিয়ে ভারতে ঢুকতে পারবে না। পশ্চিমবঙ্গের চ্যাংড়াবান্ধা ও ফুলবাড়ি দিয়েও এই পণ্য ঢুকতে দেওয়া হবে না। ভারতীয় মুদ্রায় এই সমস্ত পণ্যের বার্ষিক আমদানির মোট মূল্য সাড়ে ছ' হাজার কোটি টাকার বেশি। আওয়ামি লিগকে নিষিদ্ধ করায় তলায় তলায় জনরোষও বাড়ছে। সব মিলিয়ে ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা।

শিলিগুড়ি করিডোরের খুব কাছে লালমণিরহাটে চীনা সহযোগিতায় বিমানঘাঁটি তৈরির কথা ভাবতে শুরু করেছিল ঢাকা। কিন্তু ইউনুস রাত জেগে টিভিতে 'অপারেশন সিঁদুর' দেখার পরে বুঝেছে এসব করলে কপালে শনি নিশ্চিত।

বামনের যেমন চাঁদ ছোঁয়ার ইচ্ছা হয়, তেমনই ভারতের ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলার অদম্য ইচ্ছা হয়েছিল ইউনুসের। নিজের ক্ষমতা নেই, তাই অন্যের সাহায্য নিয়ে বাণিজ্য তথা অর্থনৈতিক কার্যকলাপের আড়ালে খানিকটা নিঃশব্দে ভারতের নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটানোর আয়োজন করেছিল। গত মার্চ মাসে ইউনুস চীন সফরে গিয়েছিলেন। সেখানেই ইচ্ছাটা প্রকাশ করেছিলেন। শিলিগুড়ি করিডোরের খুব কাছে লালমণিরহাটে চীনা সহযোগিতায় বিমানঘাঁটি তৈরির কথা ভাবতে শুরু করেছিল ঢাকা। কিন্তু ইউনুস রাত জেগে টিভিতে 'অপারেশন সিঁদুর' দেখার পরে বুঝেছে এসব করলে কপালে শনি নিশ্চিত। বিমানঘাঁটি হোক বা অন্য যে কোনও পরিকাঠামো, প্রয়োজন পড়লে তা গুঁড়িয়ে দিতে ভারতের খুব একটা সময় লাগবে না। তার নমুনা ভারতে সদ্য দেখিয়েছে। কোনো একটা ভোররাত পেলেই ভারতীয় সেনা সব তছনছ করে দিতে পারে। আর নরেন্দ্র মোদীর মতো প্রধানমন্ত্রী সব পারেন। তাই আপাতত চুপ থাকাই ভালো। আপনাকেও দিদি, আমার পরামর্শ, সীমান্ত এলাকায় আপনার ভাইয়েরা যেন বাংলাদেশের হয়ে দালালি না করেন। পরিস্থিতি কিন্তু কঠিন হয়ে উঠতে পারে।

অতিথি কলম

সোনালি মিশ্র

'সিঁদুর'-এর বর্ণে তথাকথিত নারীবাদীদের গাত্রদাহ

গত ৭ মে সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পর এমন একটি সংবাদ ভারতবাসী পেল যেটির জন্য তারা প্রায় ১৫ দিন ধরে ছিল প্রতীক্ষারত। সংবাদটি ছিল কয়েকজন ভারতীয় নারীর প্রতি ন্যায়বিচার সংক্রান্ত একটি বিষয়। সন্ত্রাসবাদীরা তাঁদের সিঁথির সিঁদুর মুছে দিয়েছিল। হিন্দু পর্যটকদের নাম ও ধর্ম জিজ্ঞাসা করে, তাঁদের পরিচয় জানার পর তাঁদেরকে হত্যা করে এই সন্ত্রাসবাদীরা তাঁদের স্ত্রীদের সিঁথির সিঁদুর মুছে দেয়। এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নিতে সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করে ভারত সরকার। সন্ত্রাসবাদ দমনের ক্ষেত্রে ভারতীয় সেনা অভিযানের নাম রাখা হয়— 'অপারেশন সিঁদুর'।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে সিঁদুরের স্থান অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আদ্যাশক্তি মহামায়া থেকে মা সীতা--- সকলের মাধ্যমেই সিঁদুরের শক্তি ও মর্যাদা বার বার প্রকাশিত হয়েছে। সিঁদুর শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় চিহ্ন নয়। সিঁদুর হলো হিন্দু পরিচয়েরও প্রতীক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদ যেসময় চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়, সেই সময়ও কপালে টিপ পরা থেকে হিন্দু মহিলাদের বিরত রাখা হতো। গত ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে হিন্দু পর্যটকদের উপর সন্ত্রাসবাদী আক্রমণে আক্রান্ত একজন মহিলা সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন যে, একজন সন্ত্রাসবাদী তাঁকে বলছিল তাঁর কপালের টিপটি খুলে ফেলতে এবং সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেলতে। ওই সন্ত্রাসবাদী তাঁকে বলে যে, এটা করলে তাঁর স্বামী বেঁচে যেতে পারেন। এই ঘটনাগুলি থেকে এটা স্পষ্ট যে, এই সন্ত্রাসবাদীরা যেকোনো প্রক্রিয়ায় ভারতীয় মহিলাদের সিঁথির সিঁদুর মুছে দিতে চায়। তার জন্য সবরকম রাস্তা তারা নিতে পারে।

বিবাহিত পুরুষদের হত্যার অর্থ তাঁদের বিবাহিতা নারীদের সিঁথির সিঁদুর মুছে দেওয়া। কিন্তু এর একটি অন্য দিকও রয়েছে। একজন বিবাহিত পুরুষকে হত্যা মানে একটি প্রজন্মকে পুরো শেষ করে দেওয়া। অসময়ে যাঁদের সিঁথি থেকে সিঁদুর মুছে দেওয়া হয়েছে, বা সন্ত্রাসবাদীরা যাঁদের সিঁথির সিঁদুর মুছে দিয়েছে, একমাত্র সেই মহিলারাই সিঁদুরের মাহাত্ম্য বা গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেন। নবরাত্রিতে দেবী দুর্গার পূজায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো সিঁদুর খেলা। সিদ্ধিবিনায়ক, বিঘ্নবিনাশক শ্রীগণেশকেও অর্ঘ্য হিসেবে সিঁদুর অর্পণ করা হয়ে থাকে। মহাবীর শ্রীহনুমান তো সিঁদুরে সদা রঞ্জিত হয়ে রয়েছেন। এই বিষয়গুলি থেকে এটি পরিস্ফুট হয় যে, হিন্দুধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সিঁদুরের গভীর যোগ রয়েছে। এই যোগের বিভিন্ন আঙ্গিক রয়েছে। এই কারণেই সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাতের ক্ষেত্রে শুরু হওয়া সামরিক অভিযানের নাম রাখা হয়েছে— 'অপারেশন সিঁদুর'। ভারতীয় সেনা অভিযানের এই নাম রাখার কারণে ভারতবাসী গৌরবান্বিত বোধ করেছে। পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসবাদী হামলার পরে ঘৃণা, ক্ষোভ ও ক্রোধের আগুনে ফুটছিল গোটা দেশ। 'অপারেশন সিঁদুর'-এর সূত্রপাতের দরুন দেশবাসীর হৃদয়ের দহনজ্বালা যেন একটু প্রশমিত হয়েছে।

কিন্তু এর মধ্যেও এক শ্রেণীর লোক রয়েছে, সিঁদুরে যাদের প্রবল অ্যালার্জি। সামরিক অভিযানের নাম 'অপারেশন সিঁদুর' হওয়ায় তাদের তীব্র আপত্তি। এই নামে তাদের আপত্তির কারণটি উপলব্ধি করা অবশ্য খুব একটা কঠিন কাজ নয়। ভারতীয়দের কাছে সিঁদুর শ্রদ্ধা ও মর্যাদার প্রতীক হলেও ভারতে একটি বড়ো শ্রেণী রয়েছে যাদের কাছে সিঁদুর হলো শোষণের প্রতীক! নাকাব, হিজাব, বোরখা ইত্যাদি হলো তাদের চোখে নারী স্বাধীনতার প্রতীক।

> "ভারতীয় মহিলারা সিঁদুরের গুরুত্ব সম্বন্ধে জানেন ও বোঝেন। সিঁদুরের মাহাত্ম্যের বিষয়ে তাঁরা সম্যকরূপে অবহিত। সিঁদুর হলো নারীশক্তি, যার পরিচয় সম্প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বকে দিয়েছে ভারত।"

এই শ্রেণীর লোকজন তাদের মনে ভারতীয় সত্তা ও হিন্দু পরিচিতির প্রতি ঘৃণাভাব পোষণ করেন। কপালে টিপ বা সিঁথিতে সিঁদুর পরিহিতা ভারতীয় নারীরা তাদের চোখে পিছিয়ে পড়া, অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত। এরা সেই শ্রেণীর লোকজন যাদের উদ্দেশ্য হলো অপপ্রচারের মাধ্যমে সিঁদুর, টিপ ইত্যাদি বিষয়ে হিন্দু নারীদের মনে বিদ্বেষ সৃষ্টি করা।

'অপারেশন সিঁদুর'-এর ছবি ও ভিডিয়ো দেশজুড়ে ভাইরাল হওয়া শুরু হতেই এই শ্রেণীর লোকজন সক্রিয় হতে শুরু করে। 'দ্য হিন্দু' পত্রিকাগোষ্ঠীর অন্তর্গত 'ফ্রন্টলাইন' পত্রিকার সম্পাদিকা বৈষ্ণা রায় এর নেতৃত্ব দেন। সামাজিক মাধ্যম 'এক্স'-এ একটি পোস্ট লেখেন। এক্স হ্যান্ডলে এই পোস্ট করার পরেই তিনি তার প্রোফাইলটিকে 'প্রোটেক্টেড' করে দেন, যাতে তার পরিচিতজন ব্যতীত বাকি সবাই এই পোস্টটিকে দেখতে না পারেন। কিন্তু ততক্ষণে সেই পোস্টের স্ক্রিনশট সামাজিক মাধ্যমে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। এই পোস্টটিতে তিনি লেখেন, ''বিচারধারার দিক থেকে 'অপারেশন সিঁদুর'-এর নামকরণের আমি বিরোধিতা করছি। এই নামটি পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিচায়ক। নারীদের সম্মান ও অধিকারের উপর সরাসরি আঘাত। মেয়েদের পবিত্রতা রক্ষা, বিবাহবন্ধনকে পবিত্র করে তোলার মতো বিভ্রান্তিকর বিষয় এই নামটির মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠে।'' তার এই পোস্টটির প্রতিবাদে সামাজিক মাধ্যমে ক্ষোভে ফেটে পড়েন অনেকেই। সামাজিক মাধ্যমে একজন এই পোস্টের প্রত্যুত্তরে লেখেন, 'সিঁদুর হলো শক্তির প্রতীক। নারীশক্তির প্রতীক হলো সিঁদুর।'

ইনি হলেন সেই বৈষ্ণা রায়, যার কাছে হিজাবের প্রতি আরোপিত নিষেধাজ্ঞা ছিল একটি গুরুতর সামাজিক সমস্যা। বর্তমানে বৈষ্ণা রায় একা নন যার 'অপারেশন সিঁদুর' নামকরণে বা 'সিঁদুর' শব্দে আপত্তি রয়েছে। বহু তথাকথিত লেখক ও প্রাবন্ধিকও 'অপারেশন সিঁদুর' নামটির বিরোধিতা করতে থাকেন। তাদের বক্তব্য হলো, ''মহিলাদের শোষণের প্রতীক হলো সিঁদুর। এই চিহ্নটি প্রতিনিয়ত মহিলাদের মনে করিয়ে দেয় যে তারা কোনো একজনের অধীনস্থ, কোনো একটি শিকলে বাঁধা রয়েছে তারা। এই কারণে সামরিক অভিযানের নাম 'সিঁদুর' রাখা কখনোই উচিত হয়নি।''

'অপারেশন সিঁদুর' নামে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের দল 'ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা'র সাংসদ মহুয়া মাজীরও প্রবল সমস্যা। তিনি বললেন, ''যাঁদের স্বামীদের হত্যা করা হয়েছিল, সেই মহিলাদের জন্য এই নামটি বেছে নেওয়া হয়েছে। এই অভিযানের নাম অন্য কিছুও রাখা যেত। তিন বাহিনীকে যখন তাদের লক্ষ্য ও সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, সেই সময়ে 'অপারেশন সিঁদুর' নামকরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী। তাই এই নামের সঙ্গে রাজনীতি জড়িত রয়েছে।' অন্য একজন মহিলা এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, 'এটা ঠিক যে এটি হলো সিঁদুর, এটা ঠিক যে ইনিই হলেন ভারতমাতা, যাঁর রক্ষা মানুষকে করতে হবে অন্য লোকজনের থেকে; যতক্ষণ না যুদ্ধের কবল থেকে দেশের মানুষ, বিশেষত নারী ও শিশুদের রক্ষার ব্যাপার আসছে!'

সামরিক অভিযানের নাম 'অপারেশন সিঁদুর' রাখার ফলে ভারতের এই তথাকথিত নারীবাদীরা অস্থির ও বিরক্ত। এমতাবস্থায় পাকিস্তানের বহু মুসলমান মহিলাও 'সিঁদুর' নামকরণের দরুন মানসিক ব্যথায় জর্জরিত ও বিপর্যস্ত। সামাজিক মাধ্যমে দেখা গেল তাদের উত্তেজনার বহিঃপ্রকাশ। জোহা নামক একজন মহিলা লিখলেন, 'যদি কেউ কিছুক্ষণ স্থির হয়ে ভাবে তবে বুঝবে যে, অপারেশন সিঁদুর হলো ভয়ানক ও মানসিক বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। এই উপমহাদেশের মালিক হিসেবে তাকে মানতে হবে বলে দাবি করে থাকে হিন্দুত্ব বিচারধারা। এই বিষয়ে বিচারাধারাটি ভীষণ আবেগপ্রবণ এবং এই নামকরণটিও মোটেই কাকতালীয় নয়। এই চিন্তাধারাটি নারীবিদ্বেষী।' সবহত জকারিয়া নামক আরেক জন পাকিস্তানি লেখেন, ''এই ধরনের ধর্মীয় চিন্তাধারা আধারিত ও হঠকারী নাম কেন? অর্থাৎ, 'সিঁদুর' নামকরণের কারণ কী?''

সামাজিক মাধ্যমে এই ধরনের মন্তব্যগুলি থেকে স্পষ্ট যে, ভারত থেকে শুরু করে পাকিস্তানের তথাকথিত নারীবাদীরা হঠাৎই 'সিঁদুর' শব্দটির তুমুল বিরোধিতা শুরু করে দিয়েছেন।

'অপারেশন সিঁদুর' নামকরণের দরুন আরেকজন তথাকথিত নারীবাদী যখন প্রায় কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছেন, সেই সময় এর বিপ্রতীপে 'অপারেশন সিঁদুর'-এর সম্পূর্ণ তথ্য ও বিবরণ সংবাদমাধ্যমের সামনে তুলে ধরলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর কর্নেল সোফিয়া কুরেশি ও বিমানবাহিনীর উইং কমান্ডার ব্যোমিকা সিংহ। এই দু'জন মহিলা সেনা আধিকারিকের মাধ্যমে ভারত সরকার পাঠালো সিঁদুরের গুরুত্ব সম্পর্কিত বার্তা। ভারতীয় মহিলারা সিঁদুরের গুরুত্ব সম্বন্ধে জানেন ও বোঝেন। সিঁদুরের মাহাত্ম্যের বিষয়ে তাঁরা সম্যকরূপে অবহিত। সিঁদুর হলো নারীশক্তি, যার পরিচয় সম্প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বকে দিয়েছে ভারত।

(লেখিকা প্রবীণ সাংবাদিক)

স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)

Back Cover	(Multi Colour)	Rs. 32,000.00
Front Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Back Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Full Page	(Multi Colour)	Rs. 20,000.00
Full Page	(Black & White)	Rs. 15,000.00
Half Page	(Black & White)	Rs. 8,000.00
Qtr. Page	(Black & White)	Rs. 4,000.00

*** বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

যোগাযোগ — মো : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

আগামীদিনে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিকে কীভাবে সাজানো সম্ভব?

সিঙ্গাপুর যখন স্বাধীনতা পায় তখন সিঙ্গাপুরের প্রথম প্রধানমন্ত্রী বলেন, যদি সুযোগ পাই, সিঙ্গাপুরকে কলকাতার মতো বানাবো। কিন্তু তার জন্য তিনি সিঙ্গাপুরে পাটকল বা সুতোর কারখানা বানাননি। পশ্চিমবঙ্গবাসীকেও আগামীদিনে তেমনই নতুন করে ভাবতে হবে ৪৯ বছর ধরে আর্থিকভাবে পরাধীন পশ্চিমবঙ্গকে নতুন পথ দেখাতে। পশ্চিমবঙ্গ না বাঁচলে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের পার্থক্য আরও বাড়বে। কিন্তু কীভাবে? প্রথমে কিছু ঘটনা তুলে ধরা যাক।

রাশিয়া, কানাডা যথাক্রমে পৃথিবীর প্রথম ও দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। প্রচুর খনিজ সম্পদ, জল, কৃষিজমি। প্রচুর মানুষ। কিন্তু টোকিয়ো, নিউ ইয়র্ক শহরের জিডিপি এই দুই দেশের থেকে বেশি। অর্থাৎ, প্রতি বছর এই দুটি শহর পৃথিবীর বৃহত্তম দেশের থেকে বেশি পণ্য উৎপাদন ও পরিষেবা প্রদান করে। মুম্বই একটা শহর এবং উত্তরপ্রদেশ ভারতের বৃহত্তম রাজ্য। মুম্বইয়ের জিডিপি উত্তরপ্রদেশের থেকে বেশি।

দ্বিতীয় যেটা উল্লেখযোগ্য তা হলো, মানুষ গরিব হয়ে জন্মায় না। গরিব স্থানে জন্মায়। কলকাতার একজন ইলেক্ট্রিশিয়ানের চেয়ে লক্ষ্ণৌয়ের ইলেক্ট্রিশিয়ানের আয় কম। লক্ষ্ণৌয়ের চেয়ে দিল্লিতে বেশি, দিল্লির চেয়ে মুম্বইয়ে বেশি, তারচেয়ে বেশি আয় দুবাইয়ে এবং নিউ ইয়র্কে আরও বেশি। অথচ সবার স্কিল সমান।

এবার আসি পশ্চিমবঙ্গের সীমাবদ্ধতা কোথায় এবং কোথায় এই রাজ্য এগিয়ে? এই রাজ্যে রয়েছে গঙ্গা নদীর শেষভাগ। পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেক বেশি। শিক্ষার প্রতি আগ্রহ রয়েছে রাজ্যবাসীর। ব্যবসার পরিস্থিতি একসময় ভালো ছিল এই রাজ্যে এবং আজ সেই পরিবেশ নেই। কারখানায় কাজ করার দিকে বাঙ্গালির মন নেই। কৃষি, গোপালন, পশুপালন, মৎস্যচাষ, পোল্ট্রি ব্যবসা মোটামুটি চলে। অর্থাৎ এক কথায়, কৃষি, বাণিজ্য এবং হোয়াইট কলার চাকরি বাঙ্গালির পক্ষে উপযুক্ত। কিন্তু উৎপাদনে (ম্যানুফ্যাকচারিঙে) এই রাজ্য পিছিয়ে। এটা বাঙ্গালির প্রকৃতির সঙ্গে মেলে না। এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গকে একটা ট্রেডিং তথা 'মাল্টিমোডাল লজিস্টিক্স হাব' হিসেবে তুলে ধরতে হবে। এই স্বপ্নকে সত্যি করা সম্ভব। কিন্তু সেটা করতে হলে কী কী প্রয়োজন?

(১) একটি মাল্টিমোডাল লজিস্টিক্স হাব, যেখানে থাকবে একটি গভীর সমুদ্র বন্দর, জলপথ, বিমানপথ, সড়ক যোগাযোগ, আধুনিক ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডোর (পণ্যবাহী রেলপথ) এবং পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ। প্রয়োজন পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বিপুল বিনিয়োগ।

(২) উৎকৃষ্ট মানের শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্র। ভারতের আইটি বা তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্রে শুধু পরিষেবা দেয়। প্রোডাক্ট বানায় না। পশ্চিমবঙ্গকে এই ব্যাপারটায় জোর দিতে হবে চীনের মতো। জলপাইগুড়ি, দুর্গাপুর, খড়্গপুর ও কলকাতার সমন্বয়ে গড়ে তুলতে হবে এই 'ইনোভেশন হাব', বা গবেষণা কেন্দ্র। যে পর্যায়ে ব্যাঙ্গালোর বা হায়দরাবাদও পৌঁছাতে পারেনি, বাঙ্গালি তার মেধাসম্পদের জোরে সেখানে পৌঁছাতে পারে।

(৩) কৃষিকে সম্পূর্ণ রপ্তানিমুখী করতে প্রয়োজন কৃষিক্ষেত্রে সংস্কার।

(৪) দরকার একটি 'হেলথ্ হাব' (উন্নতমানের হাসপাতাল, বায়োটেক / জৈব-প্রযুক্তি গবেষণা কেন্দ্র, বায়ো-ইঞ্জিনিয়ারিং গবেষণা কেন্দ্র এবং ফার্মাসি বা ওষুধ উৎপাদন শিল্প) এবং গিফট্ সিটি (গুজরাট ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্স টেক সিটি)-র মতো একটি ইন্টিগ্রেটেড ফিনান্স হাব (অর্থাৎ একটি অপারেশনাল স্মার্ট সিটি এবং ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস সেন্টার যার মধ্যে থাকবে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের কলকাতা শাখা, সবক'টি সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংক, মিউচুয়াল ফান্ড কোম্পানি, স্টক মার্কেট ইত্যাদি)।

(৫) এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের কিছু ট্র্যাডিশনাল শিল্প, যেমন— তাঁত ও হস্তশিল্প ক্ষেত্রে উৎপাদিত পণ্যগুলিকে বিদেশি বাজারে বিক্রি বা বিপণনের পরিকাঠামো প্রয়োজন।

(৬) জোর দিতে হবে পর্যটনে এবং প্রয়োজন বেশ কয়েকটি অত্যাধুনিক বিমানবন্দর।

মানুষ গরিব হয়ে জন্মায় না। গরিব স্থানে জন্মায়। কলকাতার একজন ইলেক্ট্রিশিয়ানের চেয়ে লক্ষ্ণৌয়ের ইলেক্ট্রিশিয়ানের আয় কম। লক্ষ্ণৌয়ের চেয়ে দিল্লিতে বেশি, দিল্লির চেয়ে মুম্বইয়ে বেশি, তারচেয়ে বেশি আয় দুবাইয়ে এবং নিউ ইয়র্কে আরও বেশি। অথচ সবার স্কিল সমান।

এগুলির প্রয়োজনে যেসব কারখানা বা অনুসারী শিল্পগুলি আসবে, সেটা আসুক। কিন্তু মাল্টিমোডাল লজিস্টিক্স হাবের জন্য যদি বিদেশি জাহাজ বা বিমান বা বাস কারখানা আসে তো অবশ্যই স্বাগত। কিংবা এসি, কম্পিউটার কোম্পানি ঠিক আছে। কিন্তু রপ্তানি হোক শুধু সার্ভিস বা পরিষেবা। কারণ উৎপাদন শিল্প স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জমি ও উন্নত পরিকাঠামো এই রাজ্যে নেই। বাঙ্গালির চরিত্রে কারখানায় কাজ করার অভ্যাস নেই। তাই সিঙ্গুর এপিসোড তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। □

বালোচরা কোনো দিনই পাকিস্তানভুক্ত হতে চায়নি

দুর্গাপদ ঘোষ

পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার পর ভারত যখন পাকিস্তানকে তুলোধোনা করছে, তখন অন্যদিকে 'স্বাধীনতা' ঘোষণা করে পাকিস্তানের বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছে স্বাধীনতাকামী বালোচরা। গত ৮ মে বালোচিস্তানের রাজধানী কোয়েটার একাংশেরও বেশি এলাকা থেকে পাক সেনাদের খেদিয়ে বার করে দিয়ে, পাক পতাকা টেনে নামিয়ে, ছিঁড়ে কুটি কুটি করে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। পতপত করে উড়িয়ে দিয়েছে 'স্বাধীন বালোচিস্তান'-এর পতাকা। আন্তর্জাতিক মঞ্চকে বুক চিতিয়ে জানিয়ে দিয়েছে বালোচিস্তান এখন থেকে আর পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত নয়। স্বাধীন দেশ---'ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব বালোচিস্তান'। বালোচিস্তান গণ-প্রজাতান্ত্রিক দেশ। সমাজকর্মী ও লেখক-নেতা মীর ইয়ার বালোচ গত ১৩ মে রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাছে সরকারিভাবে বালোচিস্তানকে 'স্বতন্ত্র দেশ'-এর স্বীকৃতি দেবার আবেদনও করেছেন।

এই মর্মে কালবিলম্ব না করে রাষ্ট্রসঙ্ঘের বৈঠক বসুক বলে দাবি করে তাঁদের এই অধিকারে কেউ যাতে হস্তক্ষেপ কিংবা বলপ্রয়োগ না করতে পারে সেজন্য বালোচিস্তানের সর্বত্র রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিয়ন্ত্রণাধীন নিরাপত্তা বাহিনী তথা সেনা মোতায়েনের আবেদনও জানিয়েছেন মীর ইয়ার বালোচ। দাবি করেছেন, বালোচ নাগরিকদের নিশানা করে পাক সেনাদের নিরন্তর হামলা ও নৃশংস নির্যাতন বন্ধ করার ব্যবস্থা নেওয়া হোক। বালোচিস্তানে সংবাদমাধ্যমের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে পাক সরকার সে নির্দেশ জারি করে রেখেছে তা খারিজ করে সেখানে পাকিস্তানের বাইরের সাংবাদিকদের প্রবেশের ব্যবস্থা নেওয়া হোক। সেখানে পাক প্রশাসন, বিশেষ করে পাক সেনারা কী ধরনের বর্বরতা চালিয়ে যাচ্ছে সারা বিশ্বকে তা জানানোর ব্যবস্থা করা হোক বলেও দাবি করেছেন তিনি। তাঁদের আরও দাবি, বালোচিস্তানে নিযুক্ত সমস্ত পাকিস্তানি সরকারি আধিকারিকরা অবিলম্বে চলে যাক।

কেবল দাবি উত্থাপনই নয়। গত ১১ মার্চ থেকে পাক সেনাদের বিরুদ্ধে প্রায় প্রতিদিনই সশস্ত্র প্রত্যাঘাত চালিয়ে যাচ্ছে স্বাধীনতাকামী 'বালোচ মুক্তি বাহিনী' (বিএলএ)। তাদের হাতে মার খেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে পথ পাচ্ছে না পাক সেনারা। প্রায় রোজই কম-বেশি সংখ্যায় পাক সেনা নিহত হচ্ছে। অনেক বছর ধরে সেখানে পাক-বিরোধী প্রতিবাদ যুদ্ধের রূপ নিয়েছে। কিন্তু এ বছরের ১১ মার্চের মতো ঘটনা কখনো ঘটেনি। বালোচ মুক্তি সেনারা একটা বিরাট প্রত্যাঘাত করে সারা বিশ্বের নজর কেড়ে নিয়েছে। একেবারে দিন-দুপুরে, বেলা ১টা নাগাদ কোয়েটা-পেশোয়ার যাতায়াতকারী জাফর এক্সপ্রেস ট্রেনের সামনে রকেট দেগে ট্রেনটিকে অপহরণ (হাইজাক) করে বিএলএ। পাকিস্তানের জেলে বন্দি বালোচদের মুক্তির দাবি করে প্রায় ৩ দিন ধরে জাফর এক্সপ্রেসকে আটকে রাখে। তাতে মোট ৩৫০ জনের মতো যাত্রী ছিলেন। তার মধ্যে ১৫০ জনের মতো পাকিস্তানি সেনা ছিল বলে জানা যায়। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বন্দি বালোচদের না ছাড়া হলে এক এক করে পাক সেনাদের খতম করার হুমকি দেয় বিএলএ। সেই সময় পার হয়ে যাবার পর ১০-১২ জন পাক সেনাকে হত্যা করা হয় বলে দাবি করে তারা। তবে সাধারণ যাত্রীদের কারও কোনো ক্ষতি করা হয়নি বলেও দাবি করেছে অপহরণকারীরা। ১৪ মার্চ বিশাল সেনাবাহিনী নামিয়ে ৮০ জন সেনাকে উদ্ধার করা হলেও বাকিদের সম্পর্কে পাক প্রশসান মুখ খুলতে চায়নি। বস্তুত পাক সরকারের বিরুদ্ধে এত বড়ো একটা হামলার কথা মানতেই চায়নি পাক প্রশাসন। কিন্তু যতদূর জানা যায়, তার আগে রাত-ভর পাক সেনা ও বালোচ মুক্তি সেনাদের মধ্যে তুমুল গুলির লড়াই চলে। প্রায় নাস্তানাবুদ অবস্থা হতে হয় পাক সেনাদের।

এরপর গত ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে পাকিস্তানি জঙ্গি হামলায় বেছে বেছে ২৬ জন হিন্দু পর্যটককে হত্যার এক সপ্তাহের মধ্যে ২৮ এপ্রিল পাকিস্তানের পশ্চিম

> **১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট মাঝরাতে 'পাকিস্তান' নামে নতুন দেশ বিশ্বের মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত হলেও বালোচরা প্রথম থেকেই তার অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার করে। সে সময় বালোচের ৩টি এলাকা মারকান, লামবেলা ও খারান পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হয়। কিন্তু বৃহত্তম এলাকা কালাদের শাসক খান আহম্মদ ইয়ার খান পাকভুক্ত হতে রাজি হননি। বালোচিস্তানের এই এলাকা স্বাধীন ছিল।**

ফঃ ২

সীমান্তের ডুরান্ড লাইনের কাছাকাছি দক্ষিণ ওয়াজিরস্তানে শান্তি কমিটির বৈঠক চলাকালে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে। ৭ জন নিহত এবং ১৭ জন আহত হয়। পাক প্রশাসন এজন্য ভারতের ওপর দোষ চাপানোর চেষ্টা করলেও তা ধোপে টেকেনি। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) ওই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসী হামলার প্রতিক্রিয়ায় ভারত ৬ মে মাঝরাত এবং ৭ মে-র প্রথম রাতে পাকিস্তানের মধ্যে ঢুকে যখন প্রচণ্ড প্রত্যাঘাত শুরু করে তার ৩ দিন আগে থেকে পাক সন্ত্রাস চুরমার করে দেবার জন্য হামলা চালাতে থাকে বালোচরা। ৩ মে তারা কালাদ শহর দখল করে ঘিরে রাখে। সেদিন বিএলএ-র সঙ্গে সংঘর্ষে ২২ জন পাকসেনা মারা যায়। সূত্রের খবর, গত ১৭ মার্চ থেকে ১৯ মে-র মধ্যে বালোচদের হাতে ২১৪ পাকসেনা নিহত হয়েছে।

বালোচদের ভয়ে যাকে বলে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যায় পাকসেনারা। মীরপুর ডিভিশনেও পাক সেনা রণে ভঙ্গ দিয়ে পিছু হঠতে বাধ্য হয়। তার পরদিনও বালোচরা ৪ জন পাক সেনাকে হত্যা করে। দখল করে নেয় মানগোচর শহর। এদিকে ভারত যখন পাকিস্তানকে তুলোধোনা করছে সেই সময় বালোচ স্বাধীনতাকামীদের আইইডি বিস্ফোরণে বালোচিস্তানের সাচকান এলাকায় ১২ জন পাক সেনার দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। দিনটা ছিল ৮ মে। ৯ মে কেচ লোকায় পাক সেনা কনভয়ে হামলা চালিয়ে এক এক করে ৭ জনকে গুলি করে হত্যা করে বিএলএ সদস্যরা। গত ১০ মে যেদিন পাকিস্তানের কাকুতি মিনতিতে ভারত 'অপারেশন সিঁদুর' স্থগিত রাখতে রাজি হয় সেদিন পাক বাহিনীর ওপর বালোচদের হামলা ছিল বহুমুখী। বালোচ নেতারা পরিষ্কার জানিয়ে দেন, পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধবিরতি চুক্তি হয়েছে, বালোচদের সঙ্গে হয়নি। তাঁরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবেন। যাচ্ছেনও। ১০ মে পাকসেনার কনভয়ে হামলা ছাড়াও বালোচিস্তানের আহমেদওয়ান এলাকা দখল, থানায় থানায় হামলা চালিয়ে দখল নেওয়া, রেল স্টেশন দখল করা, জাতীয় সড়ক অবরোধ ইত্যাদি ঘটনা ঘটে।

সরকারিভাবে স্বাধীনতা ঘোষণার আগে ১২ মে বালোচরা মুক্তি সংগ্রামের জন্য ভারতের কাছে অস্ত্র সাহায্য চায়। বর্তমানে বালোচদের প্রধান নেতা হলেন বশির জেব। ২০১৮ সাল থেকে তিনি এই দায়িত্বে আছেন। তাঁর আগে ২০০৬ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত প্রধান নেতা ছিলেন আসলাম বালোচ ওরফে 'আচু'। এঁদের নেতৃত্বে বালোচদের পাক বিরোধী আন্দোলন যুদ্ধের রূপ নিয়েছে। বশিরের পাশাপাশি বর্তমানে মহিলা নেত্রী বানুক মাহিকান একজন দুঃসাহসী ও ওজস্বী বক্তা। স্বাধীনতার জন্য তিনি বালোচদের বিশেষ করে মহিলাদের শহর, গ্রাম সর্বত্র সংগঠিত করে যাচ্ছেন। আর এঁদের সবাইকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে লড়াইকে আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে যাচ্ছেন ওই সমাজকর্মী ও লেখক মীর ইয়ার বালোচ। ১২ মে তাঁর পরামর্শে বালোচরা ভারতের কাছে অস্ত্র দেবার অনুরোধ করে। যদিও আন্তর্জাতিক আইন এবং বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে ভারতের পক্ষে তা সম্ভব হবে কিনা একটু ভিন্ন বিষয়। তবে একজন বালোচ নেতা ডাঃ আল্লাহ নিজার ভারতের উদ্দেশে বলেছেন যে তাঁদের অত্যাধুনিক অস্ত্র, প্রযুক্তি কিংবা পরমাণু অস্ত্রের প্রয়োজন নেই। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সাধারণ এবং পুরনো মডেলের অস্ত্রই যথেষ্ট। তিনি এমনও বলেছেন যে, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানকে নতজানু করিয়ে যে ৯৩ হাজার খান সেনাকে (পাক সেনাদের তখন এটাই বলা হতো) বন্দি করেও ভারত পাকিস্তানের হাতে ফিরিয়ে দিয়েছিল তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া সেইসব অস্ত্র বালোচদের দেওয়া হলেও তাঁরা পাকিস্তানকে 'দেখে নিতে' পারবেন। পাকিস্তানকে কীভাবে শায়েস্তা করতে হয় তা বালোচদের জানা আছে বলেও দাবি করেছেন তিনি। প্রসঙ্গত জানতে পারা গেছে যে গত ৮ মে থেকে ৭ দিনের মধ্যে বালোচরা অন্তত ৫১ জায়গায় ৭৩টা হামলা চালিয়ে পাক সেনাদের পিছু হটতে বাধ্য করেছে। ১৫ মে আবারও একটা বড়ো হামলা হয় বালোচিস্তানের পঞ্জগুরে। সেনা কনভয়ের ওপরে ওই হামলায় ১৪ জন পাক সেনা নিহত হয়েছে। বালোচদের এরকম প্রত্যাঘাত এই প্রতিবেদন যন্ত্রস্থ হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে।

এক্ষেত্রে একটা বড়ো প্রশ্ন হলো, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বালোচদের এহেন প্রত্যাঘাত চলছে কেন! অনেকেই হয়তো মনে করছেন, বালোচরা হঠাৎ করেই পাক সরকার বিশেষ করে সেনাদের বিরুদ্ধে মুখিয়ে উঠেছে। ভারত পাকিস্তানকে মেরে থেতো করে দিচ্ছে দেখে সুযোগ বুঝে বালোচরা স্বাধীনতার জন্য মাঠে নেমেছে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হলো, বালোচরা কোনোদিনই পাকিস্তানভুক্ত হতে চায়নি। ভারত ভাগ করে পাকিস্তান তৈরি হবার আগে থেকেই তারা এবং পাশতুন ও উত্তর-পশ্চিমে সীমান্ত এলাকার লোকেরা বুঝতে পেরেছিল পাকিস্তান একটা সন্ত্রাসবাদী দেশ ছাড়া কোনোদিনই কোনো সভ্য দেশ হবে না। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট মাঝরাতে 'পাকিস্তান' নামে নতুন দেশ বিশ্বের মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত হলেও বালোচরা প্রথম থেকেই তার অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার করে। সে সময় বালোচের ৩টি এলাকা মারকান, লামবেলা ও খারান পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হয়। কিন্তু বৃহত্তম এলাকা কালাদের শাসক খান আহম্মদ ইয়ার খান পাকভুক্ত হতে রাজি হননি। বালোচিস্তানের এই এলাকা স্বাধীন ছিল। ভারতের উত্তর-পূর্বে যেমন ছিল স্বাধীন ত্রিপুরা। পরে ত্রিপুরা স্বেচ্ছায় ভারতভুক্ত হলেও বালোচিস্তান তা হয়নি।

১৯৪৮ সালে পাক সরকারের সঙ্গে এক চুক্তিমতে স্বাধীন বালোচ অঞ্চলকে পাকিস্তান স্বশাসন (অটোনোমাস) দেওয়ার

প্রতিশ্রুতি দেয়। জিন্না নিজে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু সে বছরেরই ২৭ মার্চ পাক সরকার সেই প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করে কালাদকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত ও অধীনস্থ বলে ঘোষণা করে। তার এক মাসের মধ্যেই পাকিস্তান সেনা অভিযান চালিয়ে বালোচদের পাকিস্তানভুক্ত ও অধীনস্থ হতে বাধ্য করে। বলাবাহুল্য, পাকিস্তান সৃষ্টির মূল নায়ক জিন্না এবং তৎকালীন পাক প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান সরকারের বিশ্বাসঘাতকতাই বালোচদের পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ ও বিদ্রোহী করে তোলে। তাদের দমন করতে ১৯৭৩ সালে পাক প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টো বালোচিস্তানে সেনা অভিযানের নির্দেশ দেন। আর সেই নির্দেশ পাওয়া মাত্রই তার ২ বছর আগে বাংলাদেশে পর্যুদস্ত হওয়া পাক সেনারা হিংস্র নেকড়ের মতো বালোচদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

পাকিস্তান সৃষ্টির সময় থেকে মুখ্যত পশ্চিম পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের নেতা এবং সেনাধ্যক্ষদের কবজায় থাকা সরকার ও সেনাবাহিনী বালোচদের সঙ্গে বিমাতৃসুলভ নৃশংস আচরণ করে আসছে। প্রতিবাদ করতে গেলেই পাক সেনাদের বুটের তলায় মাথা থেতলে দেওয়া হচ্ছে। কথায় কথায় গুলি করে হত্যা, অপহরণ, তুলে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা, এমনকী নির্যাতন করে মেরে ফেলে অনেকের মৃতদেহ হেলিকপ্টার থেকে গ্রামে গ্রামে ছুঁড়ে ফেলার মতো বর্বরোচিত ঘটনাও বাদ যায়নি। কিন্তু পাক সরকার বালোচিস্তানে বিদেশি সংবাদমাধ্যমের প্রবেশ নিষিদ্ধ করার কারণে বালোচদের ওপর পাকিস্তানি নির্যাতনের কথা বাইরে তেমন প্রকাশ পায় না। ২০০৬ সালে জেনারেল পারভেজ মুশারফ পাকিস্তানের সেনাশাসক থাকাকালে বালোচ নেতা আকবর বুগতিকে তুলে নিয়ে গিয়ে এক পাহাড়ের গুহায় গুপ্তহত্যা করে পাক সেনারা। ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ডেরা বুগতি জেলার গৈন্ধরী গ্রামের সাধারণ মানুষদের ওপর হেলিকপ্টার থেকে এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে হত্যা করা হয়। তরুণী, যুবতীদের সেনা ছাউনিতে তুলে নিয়ে গিয়ে দানবের মতো নির্যাতন করেই ক্ষান্ত থাকেনি। কয়েকদিন পরে ২২ অক্টোবর শাম্পি বুগতি নামের এক বিবাহিত মহিলার ছিন্নভিন্ন করা রক্তাক্ত দেহ হেলিকপ্টার থেকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দেয় পাক সেনারা। এরকম বহু ঘটনার কথা নানা সময়ে প্রকাশ পেয়েছে।

সোনার খনি-সহ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ বালোচিস্তান কেবল পাকিস্তানের বৃহত্তম প্রদেশই নয়, আয়তনের দিক থেকে গোটা পাকিস্তানের প্রায় অর্ধেক, ৪৬ শতাংশ। কিন্তু এই অর্ধেক পাকিস্তানের কাছে ২৭ মার্চ দিনটা হলো 'পরাধীনতা দিবস'। তীব্র মানসিক যন্ত্রণার দিন। এখন থেকে ৭৭ বছর আগে, ১৯৪৮ সালের এই তারিখে বালোচিস্তানকে জবরদখল করে নিয়েছিল পাক সেনারা। তখন থেকে স্বাধীনচেতা বালোচরা তাদের এই ভূখণ্ডকে 'পাক অধিকৃত বালোচিস্তান' হিসেবেই দেখে আসছে। ২০১৬ সালে জেনেভায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের বৈঠকের সময় 'দ্য বালোচ হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল অ্যান্ড পাশতুন' সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সামাদ বালোচ পাক শাসকদের মুখোশ খুলে দিয়ে বলেছিলেন, 'পাকিস্তান হলো সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘর।' পাকিস্তানকে 'দুর্বৃত্ত দেশ' বলতেও বাকি রাখেননি। সেদিন জেনেভা সম্মেলনস্থলের বাইরে প্রকাশ্য রাজপথে দাঁড়িয়ে সারা বিশ্বকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, 'পাকিস্তান শুধুমাত্র বালোচ নয়, সমগ্র বিশ্ববাসীর সামনেই এক মূর্তিমান ত্রাস।' ভারতও নিরন্তর পাক সন্ত্রাসের শিকার হয়ে অনবরত প্রতিবাদ করে এসেছে। কিন্তু দুর্বোধ্য কারণে আন্তর্জাতিক মঞ্চ এতদিন যেমন বালোচদের কথা কানে তোলেনি, তেমনি ভারতের কথাও। ফলে বালোচরা নিজেদের সশস্ত্র বাহিনী (বিএলএ) তৈরি করে মাঝে মাঝে প্রত্যাঘাত করে যাচ্ছে।

এদিকে ২০১৯ সালে পুলওয়ামায় ভারতীয় সেনা ঘাঁটিতে এবং এ বছরের ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসী হামলার পর নরেন্দ্র মোদীর ভারত যখন বালাকোটে এবং পাকিস্তানের বিভিন্ন জায়গায় যথাক্রমে 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইক' এবং 'অপারেশন সিঁদুর'-এর মাধ্যমে পাকিস্তানকে নাস্তানাবুদ করে দিয়েছিল, বালোচরাও তখন একের পর এক মোক্ষম আঘাত করে গেছে 'জঙ্গিদেশ' পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। তাদের লক্ষ্য পাকিস্তানের খপ্পর থেকে বেরিয়ে স্বাধীন হওয়া। এটাই হলো উপযুক্ত সময়। বালোচ নেতারা ভারতকে পুরোপুরি সমর্থন করে বলেছেন, ভারত পাক অধিকৃত কাশ্মীর ফিরিয়ে নেবার জন্য পূর্ব দিক থেকে পাকিস্তানকে আক্রমণ করুক, বালোচরা দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে আক্রমণ করে পাকিস্তানকে চিঁড়ে চ্যাপ্টা করে দেবে।

সেটা ঠিক কতদিনে ও কীভাবে বাস্তবায়িত হবে সে ইতিহাস বলবে। কিন্তু এই মুহূর্তে পাক সেনাদের ওপর ভয়াবহ আক্রমণ শানানোর পাশাপাশি সমগ্র বালোচ জুড়ে ধ্বনি উঠছে, 'ভারত তুমি এগিয়ে যাও, আমরা তোমার সঙ্গে আছি।' পাকিস্তানের এবার খান খান হবার সময় এসেছে। পাক সেনাবাহিনীর নিরাপত্তা বলয়ের দেওয়ালে বিরাট ফাটল ধরে প্রায় ভেঙে পড়ার উপক্রম এটা দেখে আশান্বিত ও উৎসাহিত বালোচদের স্লোগান— 'এক ধাক্কা আউর দো, গিরতে দিবার তোড় দো।' আরও একটা ধাক্কা দাও, পড়ন্ত দেওয়াল গুঁড়িয়ে দাও। □

With Best Compliments from -

A Well Wisher

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দৃষ্টিতে ‘বর্তমান হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা’

ড. চন্দ্রশেখর মণ্ডল

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অমর কথাসাহিত্যিক। সাহিত্যের মাধ্যমে সমাজ নির্মাণে, সমাজের মধ্যে ভেদাভেদ দূরীকরণে, মূল্যবোধ তৈরিতে তিনি ব্যতিক্রমী লেখক। তিনি শৃঙ্খল ভাঙার কারিগর, আধুনিক ভাবনা প্রসারের অন্যতম মুক্তচিন্তক। তাঁর সাহিত্য আপামর বাঙ্গালিকে যেভাবে স্পর্শ করেছিল, অন্য কোনো লেখকের ক্ষেত্রে তা সম্ভবত হয়ে ওঠেনি। হিন্দু ধর্মে জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, উঁচু-নীচু ভেদের তিনি তীব্র সমালোচক। শুধু সাহিত্যে নয়, ব্যক্তি জীবনেও তিনি এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। যুক্ত হয়েছিলেন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে। অসবর্ণ বিবাহে হিরন্ময়ী দেবীকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করেছিলেন। ধর্ম ভাবনায় তিনি প্রকৃত অর্থে ‘পন্থনিরপেক্ষ’ মানুষ। সেই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিলিট উপাধি প্রদানের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছিল সমস্ত ইসলামি ছাত্র সংগঠন। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শরৎচন্দ্র কিংবা রবীন্দ্রনাথ যখনই তুরস্ক ও মধ্য এশিয়া থেকে ভারতে আসা হানাদার মুসলমান শাসনকালের সমালোচনা করেছেন, তখনই মুসলমানরা তাদের ‘পূর্বপুরুষ’কে সমালোচনা হিসেবে দেখেছে। সে ধারা প্রবহমান, বরং আজকের দিনে তা আরও তীব্র হয়েছে।

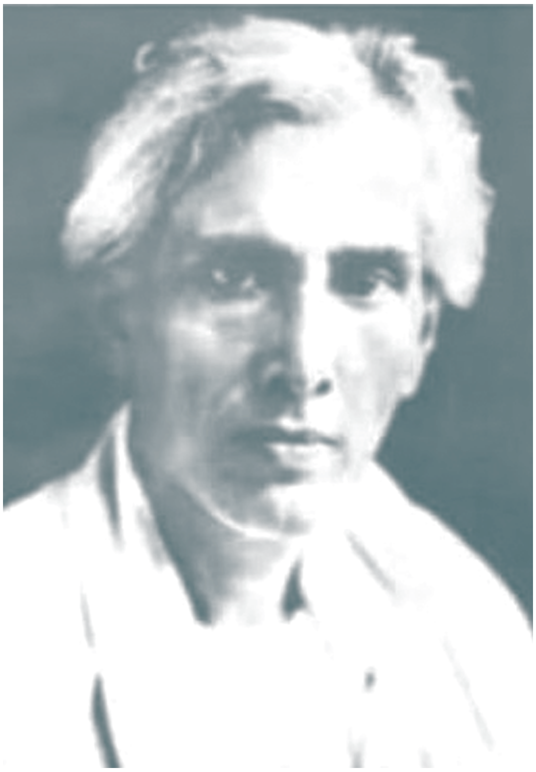

পরাধীন দেশে ১৯২৬ সালে প্রকাশিত কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা’ প্রবন্ধে সমস্যার গভীরে গিয়ে তাঁর অনুভব আজকের ভারতেও সমান প্রাসঙ্গিক। মজহব বিস্তারের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের মিশেলে যে ইসলামের আগ্রাসন সারা বিশ্বে ঘটেছে, সেই মজহবে মুক্তচিন্তা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় ইসলামিক ভ্রাতৃত্ববোধ ছাড়া অন্য কোনো অ-ইসলামিক দেশের প্রতি সমর্পণ। মুসলমানদের মন ও মানসিকতা ভারতকেন্দ্রিক হওয়ার ভাবনা অলীক কল্পনা। স্বাধীনতার আগেই তিনি লিখেছিলেন— ‘মুসলমান যদি কখনো বলে— হিন্দুর সহিত মিলন করিতে চাই, সে যে ছলনা ছাড়া আর কী হইতে পারে, ভাবিয়া পাওয়া কঠিন।’

পাকিস্তান-তুরস্ক-আরবের মতো ইসলামি দেশগুলোর প্রতি আনুগত্য ও সমর্থন মুসলমানদের মজহবি শিক্ষা। ভারত প্রেম ও ইসলাম চেতনা কখনোই সমার্থক হতে পারে না। বহুলাংশে সাযুজ্য নেই ভারতের জাতীয়তা ভাবনার সঙ্গে মুসলমানের মজহবি আবেগের। এই বাস্তবতাকে শরৎচন্দ্রের লেখা পূর্ণ সমর্থন করে— ‘হিন্দুস্থান হিন্দুর দেশ।... মুসলমান মুখ ফিরাইয়া আছে তুরস্ক ও আরবের দিকে,— এদেশে চিত্ত তাহার নাই। যাহা নাই তাহার জন্য আক্ষেপ করিয়াই-বা লাভ কী...’।

সনাতন ধর্মের উৎসভূমি, প্রাচীন সংস্কৃতির বাহক ভারতের পরাধীনতার ইতিহাস শুধু ইংরেজ শাসনের একশো নব্বই বছরের নয়, বরং তার সঙ্গে যুক্ত হবে বিদেশাগত ইসলাম শাসনের প্রায় আটশো বছরের যন্ত্রণার ইতিহাস। যে দৃষ্টিকোণ থেকেই ব্যাখ্যা হোক না কেন— শক, হুন, পাঠান, মুঘলরা লুঠ করার জন্যই এদেশে এসেছিল। দু’একজন শাসকের ক্ষেত্রে হয়তো কিছুটা ব্যতিক্রম আছে। কিন্তু ব্যতিক্রমকে উদাহরণ হিসেবে চালাতে গিয়ে অর্ধসত্য, মিথ্যা ও বিকৃত ইতিহাসই দীর্ঘদিন লালন করে চলেছে জাতি। তাই সময় এসেছে পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ইতিহাসকে পুনরায় ফিরে দেখার। তাহলেই ভবিষ্যৎ নির্মাণের পথ সুদৃঢ় হবে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখছেন— ‘একদিন মুসলমান লুণ্ঠনের জন্যই ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আসে নাই। সেদিন কেবল লুঠ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, মন্দির ধ্বংস করিয়াছে, প্রতিমা চূর্ণ করিয়াছে, নারীর সতীত্ব হানি করিয়াছে, বস্তুত অপরের ধর্ম ও

মনুষ্যত্বের উপরে যতখানি আঘাত ও অপমান করা যায়, কোথাও কোনো সংকোচ মানে নাই।'

মুর্শিদাবাদে হরগোবিন্দ দাস, চন্দন দাসেরা কেবল হিন্দু হওয়ার অপরাধে মরেছেন। হাজার হিন্দু ধর্ম বাঁচাতে, প্রাণ বাঁচাতে বাপ-ঠাকুরদা- চোদ্দপুরুষের ভিটে ছেড়ে পালিয়েছেন অন্যত্র। এই ধর্মীয় সন্ত্রাসের পেছনে বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিক ইসলামিক গোষ্ঠীগুলোর হাত আছে, এটা নিশ্চিত। কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে কলমা পড়তে না পারা এবং কেবল হিন্দু হওয়ার অপরাধে ছাব্বিশজন হিন্দু হত্যার মূল মদতদাতাও পাকিস্তান। তবে প্রতিটি ক্ষেত্রে স্থানীয় মুসলমানদের মজহবি জেহাদই সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা নিয়েছে। নিয়েছে এই কারণে যে তারাও মজহবে মুসলমান এবং সেটাই তাদের একমাত্র পরিচয়। কোনো মানবিকতা নয়, নয় গণতান্ত্রিক দেশের সহ-নাগরিকের প্রতি বিন্দুমাত্র দয়া-করুণা। তারা চালিত মজহবি জেহাদের আদর্শে, কোরান ও হাদিসে। এদেশের জনসংখ্যার আশি শতাংশ হিন্দুর দ্বারা কি এই হিংস্র সন্ত্রাসের এক শতাংশও সম্ভব? সম্ভব নয়। যদি তাই হতো তবে দেশের মুসলমান এতদিনে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। পরিবর্তে মোল্লাবাদীরা হুমকি দিয়ে রেখেছেন ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতে শরিয়ত আইন চালু করবে। আজ নয়, স্বাধীনতার আগেই হিন্দু- মুসলমানের এই স্বরূপ চিনেছিলেন শরৎচন্দ্র— 'আজ মনে হয়, এ সংস্কার উহাদের (মুসলমানদের) মজ্জাগত হইয়া উঠিয়াছে। পাবনার বীভৎস ব্যাপারে অনেককেই বলতে শুনি, পশ্চিম হইতে মুসলমান মোল্লারা আসিয়া নিরীহ ও অশিক্ষিত মুসলমান প্রজাদের উত্তেজিত করিয়া দুষ্কার্য করিয়াছে। কিন্তু এমনিই যদি পশ্চিম হইতে হিন্দু পুরোহিতের দল আসিয়া, কোনো হিন্দুপ্রধান স্থানে এমনই নিরীহ ও নিরক্ষর চাষাভুষাদের এই বলিয়া উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করেন যে নিরপরাধ মুসলমান প্রতিবেশীদের ঘরদোরে আগুন ধরাইয়া সম্পত্তি লুঠ করিয়া মেয়েদের অপমান অমর্যাদা করিতে হইবে, তা হইলে সেইসব নিরক্ষর হিন্দু কৃষকের দল তাঁহাদের পাগল বলিয়া গ্রাম হইতে দূর করিয়া দিতে এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করিবে না।' এই হলো হিন্দু-মুসলমানের শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং ধর্মাচরণের পার্থক্য। ছিল সেদিন, আজও আছে।

দেশের প্রায় কুড়ি কোটি মুসলমানের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকাকে দায়ী করে তাদের মজহব নিয়ন্ত্রিত খুন-ধর্ষণ-সন্ত্রাসকে লঘু করার চেষ্টা করেন কেউ কেউ। দেশের সকল নাগরিকের আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষার উন্নয়নের দাবিটা অন্যায্য নয়, তবে মজহবের সঙ্গে অশিক্ষাকে যুক্ত করে সন্ত্রাসের সমর্থন দেশদ্রোহিতার আর এক নাম। কথা সাহিত্যিকের বিশ্লেষণ— 'কিন্তু (মুসলমানদের), কেন এরূপ হয়? ইহা কি শুধু কেবল অশিক্ষারই ফল? শিক্ষা মানে যদি জানা হয়, তাহা হইলে চাষি-মজুরের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানে বেশি তারতম্য নাই। কিন্তু শিক্ষার তাৎপর্য যদি অন্তরের প্রসার ও হৃদয়ের কালচার হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে উভয় সম্প্রদায়ের তুলনাই হয় না।'

এতো গেল সমস্যার কথা। সমস্যার গভীরে না গিয়ে কেবল পরিস্থিতি বিচার করে সমাধানের প্রবণতা-রোগ এদেশে দীর্ঘদিনের। একথা সত্য, দেশে বিশেষ করে বঙ্গদেশে আজকের যারা মুসলমান কয়েকশো বছর আগে পর্যন্ত তারা প্রত্যেকেই হিন্দু ছিল। ছিল মূলত অন্ত্যজ-শূদ্র শ্রেণীর। উৎপত্তি, আচরণ, সংস্কৃতি, চিন্তাগতভাবে তারা একই গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ। নৃতত্ত্ব এর স্বপক্ষে রায় দিলেও, এ দাবির সঙ্গে বাস্তবের মিল মাত্র কয়েক শতাংশ। সংস্কৃতিগত পরম্পরা বহনের ক্ষেত্রে মুসলমানদের কাছে মজহব এবং ইসলাম সংস্কৃতি প্রধান। আর সব মিথ্যা। ইসলাম কেবল এদেশে ধর্মগত পরিবর্তন ঘটায়নি। আচরণ, সংস্কৃতি এবং চিন্তার জগতেও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়ে ফেলতে পেরেছে সফলভাবে। কোরান ও হাদিস নির্দেশিত মজহব চেতনা যে তাদের একমাত্র অনুকরণীয়, একথা দেশের মুসলমান সমাজ প্রতিজ্ঞার মতো করে পালন করলেও, ঠিক এর উলটো কথা বলেন মুখোশধারী কিছু 'সেকুলার' মানুষ। তাদের লক্ষ্য রাজনৈতিক, উদ্দেশ্য ইসলামের বিস্তারকে আরও সহজ করা। যেকোনোভাবে 'হিন্দু-মুসলমানের মিলন' চাই, চোখ-কান বন্ধ রেখে এই চিৎকার মূলত সমস্যা থেকে দৃষ্টি ঘোরানোর পরিকল্পিত অপচেষ্টা। অপরদিকে হিন্দুদের ভিতর উঁচু-নীচু, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, বাঙ্গালি-বিহারি, গুজরাটি-তামিল প্রভৃতিতে বিভক্ত করে হিন্দু সমাজকে আলাদা করার পরিকল্পিত চেষ্টা সেই অভিসন্ধির একটি অংশ। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখছেন— 'হিন্দু মুসলমানের মিলন একটা গালভরা শব্দ, যুগে যুগে এমন অনেক গালভরা বাক্যই উদ্ভাসিত হইয়াছে, কিন্তু ওই গাল-ভরানোর অতিরিক্ত সে আর কোনো কাজেই আসে নাই। এ মোহ আমাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে। আজ বাঙ্গলার মুসলমানকে একথা বলিয়া লজ্জা দিবার চেষ্টা বৃথা যে, সাতপুরুষ পূর্বে তোমরা হিন্দু ছিলে; সুতরাং রক্ত-সম্বন্ধে তোমরা আমাদের জ্ঞাতি। জ্ঞাতিবধে মহাপাপ, অতএব কিঞ্চিৎ করুণা কর। এমন করিয়া দয়া ভিক্ষা ও মিলন-প্রয়াসের মতো অগৌরবের বস্তু আমি তো আর দেখিতে পাই না।' এ 'অগৌরব' আর কতদিন বহন করবো আমরা?

সবার আগে হিন্দু সমাজের ভাবনা ও চিন্তাস্তরে পরিবর্তন আনতে হবে। হিন্দুধর্ম চেতনা এবং ধর্ম সংস্কৃতিতে অন্য সব উপাসনা পদ্ধতি সহ্য করার ক্ষমতা লালন করবে ঠিকই, সব ধর্মের সমন্বয়ে ভারতকে আরও শক্তিশালী করার প্রতিজ্ঞাও থাকবে নিশ্চিতভাবে। কারণ হিন্দুত্ব ও ভারতীয়ত্ব তো সমার্থক; হিন্দু সংস্কৃতি ভারতবাসীকে সেই শিক্ষাই দেয়। তবে মূল কথা হলো কয়েক শতাব্দী ধরে জমে থাকা সমস্যার সমাধান কেবল মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুদের মিলন আকঙ্ক্ষা দ্বারা পূর্ণ হবে না। বরং হিন্দু সমাজের অন্তর্গত জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা ভুলে একত্রিত হওয়ার মধ্য দিয়েই সমাধানের উৎসমুখ খুলে যেতে পারে। 'হিন্দুর সমস্যা এ নয় যে, কী করিয়া এই অস্বাভাবিক মিলন সংঘটিত হইবে; হিন্দুর সমস্যা এই যে, কী করিয়া তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারিবেন এবং হিন্দুধর্মাবলম্বী যে-কোনো ব্যক্তিকেই ছোটো জাতি বলিয়া অপমান করিবার দুর্মতি তাঁহাদের

কেমন করিয়া এবং কবে যাইবে।' সেই সঙ্গে তিনি হিন্দু সমাজের ভাবনার জড়ত্বে কুঠারাঘাত করেছেন— 'হিন্দু-মুসলমানের মিলন হইল না বলিয়া বুক চাপড়াইয়া কাঁদিয়া বেড়ানোই কাজ নয়। নিজেরা কান্না বন্ধ করিলেই তবে অন্য পক্ষ হইতে কাঁদিবার লোক পাওয়া যাইবে।' এই পথই হোক সমগ্র হিন্দু সমাজের পথ।

স্বাধীনতার পরে হিন্দু-শূন্য পাকিস্তান, পরম শূন্যের দিকে এগোনো বাংলাদেশের হিন্দুদের দীর্ঘদিনের চেনা সেই আর্তনাদই এখন শোনা যাচ্ছে সুতি, সামশেরগঞ্জ, ধুলিয়ান-সহ মুসলমান সংখ্যাগুরু জেলাগুলোতে। নিজের ভিটেমাটি ছেড়ে পালিয়ে যেতে যেতে হাতজোড় করে মুসলমানদের কাছে প্রাণ ভিক্ষা করছে হিন্দুরা। হিন্দু রমণী কাঁদতে কাঁদতে বলছেন— 'আমার সন্তানের চেয়েও ছোটো, এত দিনের প্রতিবেশী মুসলমান ছেলেটি আমাকে বলছে— তোমার সম্ভ্রম দাও, আমি তোমার স্বামীকে ফিরিয়ে দেব।' আজকের মালদায় নারীর সম্ভ্রম নেই, চোদ্দ পুরুষের ভিটে-বসতবাড়ি নেই, ধ্বংসাবশেষ হয়ে জেগে আছে কালী-শীতলা-দুর্গা প্রতিমা, মন্দিরের দালান। মুসলমানদের এইসব সন্ত্রাস-রক্তচক্ষুর সামনে সেই কবে থেকে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে সমগ্র হিন্দুসমাজ। তার কি কিছুমাত্র পরিবর্তন ঘটেছে? তিনি লিখছেন— 'অত্যাচার ও অনাচারের বিবরণ সকল স্থান সংগ্রহ করিয়া এই কথাটাই কেবল বলিতেছি— তুমি এই আমাকে মারিলে, এই আমার দেবতার হাত-পা ভাঙ্গিলে, এই আমার মন্দির ধ্বংস করিলে, এই আমার মহিলাকে হরণ করিলে,— এবং এ সকল তোমার ভারি অন্যায়, ও ইহাতে আমরা যারপরনাই ব্যথিত হইয়া হাহাকার করিতেছি। এসকল তুমি না থামাইলে আমরা আর তিষ্ঠিতে পারি না। বাস্তবিক ইহার অধিক আমরা কি কিছু বলি, না করি?'

অন্ধকার যুগের অবসান একদিন হবে। সময় বুঝে নেবে সব হিসেব। সেই সময় হয়তো সমাগত। আজকের এই কালবেলায় দাঁড়িয়ে হিন্দুদের করণীয় অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করে যেতে ভোলেনি তাঁর লেখা। 'আমরা নিঃসংশয়ে স্থির করিয়াছি যে, যেমন করিয়াই হউক মিলন করিবার ভার আমাদের (হিন্দুদের) এবং অত্যাচার নিবারণ করিবার ভার তাহাদের (মুসলমানদের)। কিন্তু, বস্তুত হওয়া উচিত ঠিক বিপরীত। অত্যাচার থামাইবার ভার গ্রহণ করা উচিত নিজেদের এবং হিন্দু-মুসলমান-মিলন বলিয়া যদি কিছু থাকে তো সে সম্পন্ন করিবার ভার দেওয়া উচিত মুসলমানদের 'পরে।'

গণতান্ত্রিক পরিসরে সমাধানের দায় সব ধর্মের মানুষের। আক্রমণকারী যেহেতু মুসলমান, সুতরাং লাগাতার এ হত্যালীলা থামানোর মুখ্য দায় তাদেরই নিতে হবে। অথচ গোটা মুসলমান সম্প্রদায় ও নেতাদের ভাবনা, প্রথমত তারা মুসলমান তারপর বাঙ্গালি, কাশ্মীরি, গুজরাটি, কংগ্রেসি, তৃণমূলি, কমিউনিস্ট এবং সম্ভবত সবশেষে ভারতীয়। সে কথা প্রকাশ্যে জোর গলায় জাহির করে নিজ নিজ অবস্থান পোক্ত করেছেন হুমায়ুন কবির, ফিরহাদ হাকিম, আসাদুদ্দিন ওয়েসিদের মতো কেউ কেউ। অনেকেই প্রশ্ন করেন ধর্মহীন, ধর্মনিরপেক্ষ অনেক হিন্দু নেতা দেশে আছেন যারা প্রকাশ্যে গোমাংস খেয়ে নিজেদের 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র প্রমাণ দেন। অথচ কোথাও কি কোনো মুসলমান নেতা আছে যারা শুয়োরের মাংস খেয়ে নিজেদের 'ধর্মনিরপেক্ষ' ঘোষণার সাহস নাই দেখাক, অন্তত একতরফা এই হিংসাকে ধর্মীয় সন্ত্রাস বলার 'গণতান্ত্রিক সৌজন্য' দেখাবে! না নেই। কিন্তু কেন? তারাও তো শিক্ষা পেয়েছে। সবাইতো মাদ্রাসার পাঠ নেয়নি। তারাও ভারতে জন্মেছে, বড়ো হয়েছে ভারতের সব সুবিধা নিয়ে। কারণটা বোধহয় খুব স্পষ্ট। সবকিছুর ঊর্ধ্বেই তাদের মজহব এবং সেই গ্রন্থের নির্দেশ। ব্যতিক্রম কেউ নয়। পাঁচশো টাকার বিনিময়ে পাথর ছোঁড়া কিশোর, প্রতিবেশী রমণীর সম্ভ্রম খুবলে নেওয়া যুবক, পৃথিবীর সব কাফের নারীকে গনিমতের মাল ভাবা 'বলিষ্ঠ পুরুষ', রাজনৈতিক নেতা, শিক্ষক, অধ্যাপক, কবি, সাহিত্যিক। একই প্রশ্ন সেদিনও ছিল। শরৎচন্দ্র সব স্তরের মুসলমানের চরিত্রের মুখোশ টেনে খুলেছেন এবং জোরালো অক্ষরে ব্যক্ত করেছেন কোনো রাখঢাক না রেখেই— 'হিন্দু নারী হরণের ব্যাপারে সংবাদপত্রওয়ালা প্রায়ই দেখি প্রশ্ন করেন, মুসলমান নেতারা নীরব কেন? তাঁহাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা যে পুনঃ পুনঃ এত বড়ো অপরাধ করিতেছে, তথাপি প্রতিবাদ করিতেছে না কীসের জন্য? মুখ বুজিয়া নিঃশব্দ থাকার অর্থ কী? কিন্তু আমার তো মনে হয় অর্থ অতিশয় প্রাঞ্জল। তাঁহারা শুধু অতি বিনয়বশতই মুখ ফুটিয়া বলিতে পারেন না, বাপু, আপত্তি করব কী, সময় এবং সুযোগ পেলেও কাজে লেগে যেতে পারি।'

দেশে ইসলামের আগমনের সময়কাল থেকেই সমাজের অন্তরে-অন্দরে লুকিয়ে থাকা এই ভয়ংকর রোগ থেকে মুক্তির উপায় খুঁজে পাওয়া খুব সহজ নয়। সহজ নয়, ২০৪৭ সালের মধ্যে দেশে শরিয়ত আইন লাগুর হুমকি দেওয়া মোল্লাবাদীদের নিয়ন্ত্রণ করা। তবে সে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে নিরন্তরভাবে। এবং শুরুটা এখনই করতে হবে। হয়তো এখন সেই মানুষ সংখ্যায় কম, নেহাত হাতে গোনা কয়েকজন। তবে রাস্তা খুঁজতে হবে পরিষ্কার মন, পরিচ্ছন্ন ভাবনা থেকে। যে কাজটা শরৎচন্দ্র শুরু করেছিলেন প্রায় একশো বছর আগে, সেটা আমাদেরই সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব নিতে হবে। অনেক টিপ্পনী, অনেক আক্রমণ, অনেক বিরোধিতা থাকবে এবং থাকবে স্বাভাবিক কারণেই। তবু এ-কাজ বন্ধ করার অর্থ নিশ্চিত ধ্বংসের প্রস্তুতি নেওয়া। হার-না-মানা সে জেদের ভাষা জুগিয়েছেন স্বয়ং শরৎচন্দ্র। 'আমেরিকা যখন স্বাধীনতার জন্য লড়াই করিয়েছিল, তখন দেশের অর্ধেকের বেশি লোকে তো ইংরাজের পক্ষেই ছিল। আয়ার্লন্ডের মুক্তিযজ্ঞে কয়জনে যোগ দিয়াছিল? যে বলশেভিক গভর্নমেন্ট আজ রুশিয়ার শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছে, দেশের লোকসংখ্যার অনুপাতে সে তো এখনো শতকে একজনও পৌঁছে নাই। মানুষ তো গোরু-ঘোড়া নয়, কেবলমাত্র ভিড়ের পরিমাণ দেখিয়াই সত্যাসত্য নির্ধারিত হয় না, হয় শুধু তাহার তপস্যার একাগ্রতার বিচার করিয়া।' তিনি বুঝেছিলেন, আমরা বুঝবো কবে?

সূত্র : ১৯২৬ সালে প্রকাশিত কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা'।

ইউনুসের নেতৃত্বে বাংলাদেশ জেহাদি দেশে পরিণত হতে চলেছে

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি।। "আপনার সঙ্গে কোনো হিন্দু সমস্যা করলে, সরাসরি বলে দিন সে রাসুলের শানে বেয়াদবি করেছে। কোনো প্রমাণ লাগবে না। বাংলাদেশের আইন প্রশাসন সবকিছু থেকে বড়ো ইসলামের দোয়াই, প্রশাসনের বাপের ক্ষমতা নেই কোনো হিন্দুকে বাঁচানোর। হিন্দুদের জন্য কেউ এগিয়ে আসবে না। হিন্দুরা ভীতু, তারা বলবে সে মরলে আমাদের কী। আর আমাদের সহী মুসলমান ভাইয়েরা এমন বিষয় পেলে যে প্রতিক্রিয়া দেখায়, আলহামদুলিল্লাহ। ইয়া রাব্বুল আলামিন, আপনি এমন সহীহ মুসলমানের পাশে থাকবেন খোদা।

এরপর প্রশাসন তো আলহামদুলিল্লাহ। পুলিশের ভেতরে আমাদের সহীহ মুসলমানের সংখ্যা বেশি। এমন মামলা পেলে তারা আরো আমাদের সাহায্য করে। বাংলাদেশে হিন্দু বিতাড়িত করতে আমাদের পুলিশ ভাইয়েরা মাশাআল্লাহ। আপনি কোনো হিন্দুর জায়গা সম্পত্তি দখল করতে চান? বলে দিন সে ইসলামের অবমাননা করেছে, আপনি সফল হবেন।"

এক ইসলামিক স্কলারের এই রকম একটি বার্তা সামাজিক মাধ্যমে কয়েকদিন ধরে ভাসছে, আর তাতে হিন্দুদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে। কোনো সভ্য দেশে এই ধরনের হুমকি বার্তা প্রচারিত হতে পারে এটাই আশ্চর্য। সরকার কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। একজন নোবেল শান্তি বিজয়ীর হাতে বর্তমানে দেশ। তাঁর আমলে এটাই বাংলাদেশের প্রকৃত চিত্র।

এখন বাংলাদেশের রাজধানীতে আইএস (ইসলামিক স্টেট), আল কায়েদা কিংবা হিযবুত তাহরির-এর পতাকা নিয়ে, ওসামা বিন লাদেনের ছবি নিয়ে নির্ভয়ে মিছিল করা যাবে, যদিও সবগুলো নিষিদ্ধ সংগঠন আন্তর্জাতিক ভাবে, বাংলাদেশেও। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধে নিহত ত্রিশ লক্ষ মানুষের কথা বলা যাবে না, পাকিস্তানি হানাদার ও তাদের দোসর রাজাকার, আল বদরদের নির্যাতন-ধর্ষণের শিকার লক্ষ লক্ষ মা-বোনের কথা বলা যাবে না। মুক্তিযুদ্ধের স্লোগান 'জয় বাংলা' উচ্চারণ করা যাবে না। পাকিস্তানে দীর্ঘ স্বাধিকার আন্দোলন এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধে

মহম্মদ ইউনুস

জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান

নেতৃত্বদানকারী দলের নাম নেওয়া যাবে না, কিন্তু সেই মুক্তিযুদ্ধে যারা ত্রিশ লক্ষ মানুষ হত্যা করেছে, চার লক্ষেরও বেশি মা-বোনের সম্ভ্রম নষ্ট করেছে, অনেককে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিয়েছে, সেই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের হিংসার দোসরদের বিরুদ্ধে কিছু বলা যাবে না। এসব দিকে কড়া নজর অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান অধ্যাপক ড. মহম্মদ ইউনুসের, তাঁর উপদেষ্টাদের। নজর রয়েছে গত বছরের জুলাই-আগস্টে জেহাদি আন্দোলনের ছাত্রনেতাদের, যারা সম্প্রতি জাতীয় নাগরিক পার্টি গঠন করে রাজনীতিতে নেমেছে; নজর রয়েছে বিএনপি ও জামায়াত নেতাদের যারা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন। বাংলাদেশে ইউনুসের সরকারের আমলে ইসলামি উগ্রবাদের উত্থানের আশঙ্কা জানিয়ে আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে বেশ কিছু প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। নিউইয়র্ক টাইমস এ নিয়ে একটি প্রতিবেদন করেছে। ঢাকায় প্রকাশ্যে ওসামা বিন লাদেনের ছবি হাতে বিক্ষোভের ছবিও প্রকাশ করা হয়েছে।

আওয়ামি লিগ ইতিমধ্যে নিষিদ্ধ হয়েছে ইউনুস এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে এক সুন্দর চিত্রনাট্য তৈরি করেছেন। এই চিত্রনাট্য অনুযায়ী গত বছর হাসিনার বিরুদ্ধে আন্দোলন নামা ছাত্রদের গঠিত রাজনৈতিক দল জাতীয় নাগরিক পার্টিকে (এনসিপি) (যে দলকে কিংস পার্টি বলে অভিহিত করা হচ্ছে) রাস্তায় নামিয়েছেন, তারা ইউনুসের বাসভবন-কার্যালয় যমুনার সামনে বিক্ষোভ শুরু করে। এখানে কিন্তু বিক্ষোভ নিষিদ্ধ, অথচ এখানে বিক্ষোভকারী ছাত্রদের মঞ্চ তৈরি করতে দেওয়া হয়েছে। গরমে কষ্ট লাঘব করতে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন অত্যাধুনিক স্প্রে ক্যানন যন্ত্রে জল ছিটিয়ে তাপমাত্রা কমিয়েছে। পরে শাহবাগে গিয়ে আন্দোলন শুরু হয়, যেখানে আন্দোলন- বিক্ষোভ নিষিদ্ধ। কিন্তু ইউনুসপন্থী ছাত্রদের জন্য নিষিদ্ধ নয়। চিত্রনাট্যের শেষ পর্বে ছিল উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক, তাও সুষ্ঠুভাবে মঞ্চস্থ হয়েছে। আওয়ামি লিগ ও সব অঙ্গ সংগঠনের কার্যক্রম নিষিদ্ধ হয়েছে। অথচ এর আগে কয়েকটি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে ইউনুস বলেছেন, কোনো দলকে নিষিদ্ধ নয়, অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন চান তিনি।

বর্তমানে বাংলাদেশের আরও কিছু চিত্র দেখা যেতে পারে।

আওয়ামি লিগ নিষিদ্ধের দাবিতে জাতীয় নাগরিক পার্টির শাহবাগে সমাবেশের সময় জাতীয় সংগীত গাইতে বাধা দেওয়া হয়েছে। স্লোগান উঠেছে, 'গোলাম আজমের বাংলাদেশে শেখ হাসিনার ঠাঁই নাই', 'নিজামির বাংলাদেশে আওয়ামি লিগের ঠাঁই নাই'।

গোলাম আজম জামায়াতে ইসলামির আমির ছিলেন। মতিউর রহমান নিজামি জামায়াতের শীর্ষ নেতা ছিলেন। দুজনেই মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনীর সহযোগী হিসেবে গণহত্যায় অংশ নেন। বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীদের হত্যার পরিকল্পনায় সক্রিয় জড়িত ছিল জামায়াতে ইসলামি। ২০০৯ সালে শেখ হাসিনা দ্বিতীয় দফায় সরকার গঠন করার পর একাত্তর সালে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে নিজামি-সহ জামাতের শীর্ষ নেতাদের বিচারে ফাঁসি হয়। গোলাম আজম অবশ্য বিচারের আগেই কারাগারে মারা যান।

জেহাদ ফর খিলাফত বাংলাদেশ সম্প্রতি প্রিয় ইসলামি যোদ্ধা ও প্রাণপ্রিয় তাওহিদি (তৌহিদি) জনগণের প্রতি এক প্রকাশ্য বার্তায় বলেছে, ‘হাসিনা এদেশে নারীদের দৌরাত্ম্য অন্য পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে, নারীদের বেহায়া ও বেয়াদব বানিয়ে দিয়েছে। নারীদের কাজ কর্ম ও প্রভাবে সমাজ অপবিত্র ও কলুষিত হচ্ছে। নারীদের শিক্ষার নামে দৌরাত্ম্য বন্ধ করা হবে। তাদেরকে ঘরের বাইরে কোনো কাজের অনুমতি দেওয়া হবে না, খেয়ালখুশিমতো পোশাকে বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। এগুলোর ব্যত্যয় ঘটলে কঠিন ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা হবে। নারীদের উচ্চ শিক্ষার নাম দিয়ে কাফেরদের বেহায়াপনার ষড়যন্ত্র বন্ধ করা হবে এবং তাদেরকে ঘরের কাজ-সহ মুসলমান উম্মাহর জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে ফিরিয়ে নেওয়া হবে, এটা হবে আপনাদের জন্য খিলাফতের উপহার ও প্রতিজ্ঞা।’

‘নারীরা মাহরাম ব্যতীত কারও কাছে ভিড়লে ভয়ংকর শাস্তি দেওয়া হবে, বেত্রাঘাত থেকে শুরু করে পাথর ছোঁড়া পর্যন্ত। দেশে নারীদের বেহায়াপনা ও দৌরাত্ম্যের দিন শেষ করে সভ্যতা আনা হবে।’

তৌহিদি বা তাওহিদি জনতা এবার আমের নাম পরিবর্তনের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিয়ে দাবি জানিয়েছে। তাদের মতে, কিছু কিছু আমের নাম নাকি এতটাই হিন্দুসংস্কৃতির যে সেগুলো শুনলেই ঈমান নড়বড়ে হয়ে যায়। এসব ‘শিরক মার্কা আমের’ কারণে দেশের মানুষের আখেরাত বিপদের মুখে। তাই নাম পরিবর্তনের জন্য কিছু পবিত্র প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

এসব প্রস্তাবে রয়েছে, গোপালভোগের নাম পরিবর্তন করে সুলতানিভোগ, গোবিন্দভোগের নাম জালালিভোগ, লক্ষ্মণভোগের নাম বদরভোগ, হিমসাগর মদিনাসাগর, আম্রপালি খাদিজাপলি, কৃষ্ণভোগ নবীভোগ, মালদাভোগ মক্কাভোগ নাম রাখতে হবে। সূর্যপুরিকে বলতে হবে ফজরপুরি।

পরবর্তী ধাপে কলা, কাঁঠাল, তরমুজ ইত্যাদির নাম পরিবর্তনের প্রস্তাবও কৃষি মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে বলে জানানো হয়েছে।

বর্তমান সংবিধানের কথাই ধরা যাক। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর পাকিস্তানবিরোধী দীর্ঘ গণআন্দোলন ও চূড়ান্ত পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধ ধারণ করে ১৯৭২ সালে রচিত হয়েছিল সংবিধান, যার চার মূল নীতি হিসেবে গৃহীত হয়েছিল গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবোধ (বাঙ্গালি) ও সমাজতন্ত্র। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার পর জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে প্রথমেই সংবিধানে হাত দেন। সংবিধানের সূচনায় ‘বিসমিল্লাহ ও মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস’ যুক্ত হয়, মূল নীতি থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র বাদ দেওয়া হয়, বাঙ্গালি জাতীয়তাবোধের সংজ্ঞা পরিবর্তিত হয়ে ব্যাখ্যায় ইসলামি জাতীয়তাবোধ বলা হয়। পরবর্তীতে জেনারেল হুসেইন মহম্মদ এরশাদ ক্ষমতায় এসে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করে সংবিধান সংশোধন করেন। শেখ হাসিনা ২০০৯ সালে দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় এসে সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা ফিরিয়ে এনে কিছু সংশোধন করেন, তবে ইসলামে কোনোভাবে হাত দেননি। অর্থাৎ বিসমিল্লাহ, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বহাল থাকে।

বর্তমান শাসকরা এই সংবিধানও ছুঁড়ে ফেলতে চান। তাদের যুক্তি, এই সংবিধান ফ্যাসিস্ট আওয়ামি লিগের তৈরি। নতুন সংবিধান রচনার জন্য কমিশন হয়েছে, যে কমিশন অমুসলমান কোনো সংগঠনের বক্তব্য শোনেনি। আওয়ামি লিগ নিষিদ্ধ, অন্য সব দলকে আলোচনায় ডাকা হয়েছে। বামপন্থী কয়েকটি দল বর্তমান সংবিধানের পক্ষে বলেছে। বিএনপি জিয়ার দল সেই ইসলামি ধারা থেকে সরতে নারাজ। জামায়াতে ইসলামি, হেফাজতে ইসলাম, ইসলামি শাসনতন্ত্র আন্দোলন-সহ সব ইসলামি দলের পাশাপাশি অন্য ছোটো ছোটো দলও ইসলামি সংবিধানের দাবি রেখেছে। ছাত্রদের নবগঠিত দল জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) তো জামায়াতে ইসলামি ও অন্য ইসলামি দলগুলোরই নবীন সংস্করণ। প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুস যেভাবে আগামী বাংলাদেশ চান সেভাবেই সবকিছু এগুচ্ছে। এ কারণেই শান্তিতে এই নোবেল বিজয়ী প্রায় এক ডজন সংস্কার কমিশন করেছেন, যার মাত্র একটিতে একজন হিন্দুকে সদস্য করেছেন। সেটি সংবাদমাধ্যম সংস্কার কমিশন। আর কোনো কমিশনে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের স্থান হয়নি। ইউনুসের প্রচণ্ড ভয়।

ইউনুস প্রচণ্ড চতুর। তিনি একদিকে রেখেছেন আন্দোলনের ছাত্র নেতাদের, অন্যদিকে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা-সহ বড়ো বড়ো পদগুলোতে রেখেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে নিয়ে আসা মার্কিন নাগরিক বাঙ্গালি মুসলমানদের, যারা প্রচণ্ডভাবে আওয়ামি লিগ বিরোধী। এরা গত বছরের জুলাই-আগস্টে শেখ হাসিনাবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে যুক্তরাষ্ট্র থেকে জোরালো সমর্থন দিয়েছেন। হিন্দুদের প্রতিও তাদের বিরাগ লক্ষ্য করা যায়। ইউনুসের পছন্দ আছে বলতে হবে!

মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশকে কবর দিয়ে তালেবানি বাংলাদেশ উপহার দিতে ইউনুস ও তাঁর শক্তি ছাত্ররা মরিয়া চেষ্টা করছে। কয়েক দশক ধরে ‘আমরা সবাই তালেবান, বাংলা হবে আফগান’ স্লোগান দেওয়া মানুষগুলোই এখন অন্তর্বর্তী সরকারের শক্তি। একারণেই হয়তো ইউনুস ও গত বছর জুলাই-আগস্টে শেখ হাসিনা সরকারের পতন ঘটানো ছাত্ররা নিশ্চিন্ত।

গত ২১ মে ঢাকার সেনানিবাসে অনুষ্ঠিত একটি গোপন বৈঠকে সেনা অফিসারদের উদ্দেশ্যে তার ভাষণে ইউনুস প্রশাসনের প্রতি বিরক্তি ও হতাশা প্রকাশ করেন বাংলাদেশের সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। আগামী ডিসেম্বরের মধ্যেই জাতীয় নির্বাচন হয়ে যাওয়া উচিত বলে তিনি জানান। এরপরই গত ২২ মে প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুস পদত্যাগের হুমকি দিয়েছেন বলে সংবাদসূত্রের খবর। □

এত ছুটি কেন?

সরকারি স্কুলের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী গরমের ছুটি পড়ার কথা ছিল ১২ মে এবং ছুটির পর স্কুল খোলার কথা ২৩ মে। রবিবার বাদে মোট ১১ দিন ছিল গ্রীষ্মাবকাশের ছুটি। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সরকারি নির্দেশে গরমের ছুটি শুরু হয় ৩০ এপ্রিল এবং শেষ হয় ৩১ মে। ২ জুন ফের স্কুল খোলে। গতবছরের ছুটির তালিকা অনুযায়ী গ্রীষ্মাবকাশ ছিল ১০ দিনের। কিন্তু তা ১০ দিনে সীমাবদ্ধ না থেকে বাড়তে বাড়তে মাসাধিক কালে পর্যবসিত হয়। দায়ী করা হয় গ্রীষ্মের প্রখর তাপপ্রবাহকে। কিন্তু কেন জলবায়ুর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ছুটির তালিকা তৈরি করা হয় না? তার কোনো সদুত্তর নেই। সেক্ষেত্রে অন্যান্য ছুটি বাঁচিয়ে গ্রীষ্মাবকাশে কাজে লাগানো যেতে পারে। এবছর পূজার ছুটির তালিকায় ২৫ দিন রাখা হয়েছে। মাঝে রবিবারগুলো ধরলে ২৮ দিনের ধাক্কা। তাই পার্বণের দিনগুলো বাদ দিয়ে পঠনপাঠনের জন্য কটা দিন অনায়াসে কাজে লাগানো যেত। বরং ওই সময় আবহাওয়া উপযুক্ত থাকে। পূজার ছুটি থেকে কটা দিন বাঁচিয়ে গরমের ছুটিতে কাজে লাগাতে পারলে ফিবছর বেশকিছু পঠনপাঠন দিবস নষ্ট হতো না। এমনিতেই নতুন নিয়মে দ্বাদশশ্রেণীর তৃতীয় সেমিস্টারের পরীক্ষা হওয়ার কথা সেপ্টেম্বর মাসে। কিন্তু ছুটি চলতে থাকলে তৃতীয় সেমিস্টারের সিলেবাস শেষ হবে কীভাবে তার কোনো সদুত্তর নেই।

—**অজয় ভট্টাচার্য**
বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা।

কাশ্মীরের ইতিহাস মনে রাখতে হবে

১৯৯০ সালের ১৯ জানুয়ারি কাশ্মীরে হিন্দুদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছিল। কাশ্মীরের ইতিহাসের একটি কালো দিন। কাশ্মীরি হিন্দুদের নিজের দেশেই শরণার্থী হতে হয়েছিল। স্বাধীন ভারতবর্ষে ১৯৮৯-৯০ সালে কাশ্মীর থেকে বিতাড়িত হতে হয়েছিল ৬ লক্ষ হিন্দুকে। কাশ্মীরের ক্ষমতায় তখন ওমর আব্দুল্লা-পুত্র ফারুক আব্দুল্লা। ১৯৮৯-এর জুলাই মাসে ফারুক আব্দুল্লা কুখ্যাত ৭০ জঙ্গিকে কাশ্মীর কারাগার থেকে নিঃশর্ত মুক্তি দিলেন কেন? কোনোদিন এর উত্তর পাওয়া যায়নি। আর তারপরেই চললো ক্রমাগত হিন্দু নিধন। ১৯৯০ সালের ৪ জানুয়ারি হিজবুল মুজাহিদিন দেশের প্রশাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ইসলামিক দাদাগিরি করে প্রকাশ্য গণমাধ্যমে রীতিমত বিজ্ঞপ্তি জারি করে ঘোষণা করল— হিন্দুদের কাশ্মীর ছাড়তে হবে। হিন্দু বাড়ির দরজায় কাশ্মীর ছাড়ার নোটিশ ঝুলিয়ে দিল জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি। স্লোগান উঠল— কাশ্মীরে থাকতে গেলে আল্লা হু আকবর বলতে হবে। আর এর সঙ্গে শুরু হলো নৃশংস গণহত্যা।

প্রখ্যাত সমাজসেবী টিকালাল তাপলুকে শ্রীনগরে প্রকাশ্য দিবালোকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। হত্যা করা হয় বিচারপতি নীলকণ্ঠ গঞ্জুকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর ছিন্ন ভিন্ন দেহ রাস্তায় পড়ে থাকে। নিহত হলেন আইনজীবী প্রেমনাথ ভাট। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সর্বানন্দ কাউলকে কপালে তিলক পরার জায়গায় পেরেক ঠুকে তিলে তিলে হত্যা করা হয়। বি কে গঞ্জুকে হত্যা করে তার রক্তে মাখা চাল স্ত্রীর মুখে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। তাঁর স্ত্রীকে গণধর্ষণ করে হত্যা করা হয়। নার্স সরলা ভাটকে প্রকাশ্য রাস্তায় গণধর্ষণ করে নগ্ন মৃতদেহ রাস্তায় উঁচুতে ঝুলিয়ে দেয়। রবীন্দ্র পণ্ডিতের মৃতদেহ নিয়ে উল্লাসে মেতে নাচতে থাকে হিজবুল মুজাহিদের জঙ্গিরা। সোপিয়ানে ব্রজলালকে হত্যা করে মৃতদেহ জিপের পিছনে বেঁধে ঘোরানো হয়। স্কুলশিক্ষিকা গিরিজা টিক্কুকে নৃশংসভাবে গণধর্ষণ করে হত্যা করা হয়। এই ভয়াবহ গণহত্যায় রক্ষা পায়নি শিশুরাও। জীবন, সম্মান এবং তার সঙ্গে ধর্ম বাঁচাতে সমস্ত সম্পত্তি ফেলে রেখেই কাশ্মীরি পণ্ডিতরা দলে দলে কাশ্মীর ছেড়ে পালিয়ে আসে জম্মু ও দিল্লিতে। তারা কিন্তু একবারের জন্যও অস্ত্র তুলে নেন বা সন্ত্রাসবাদের পথে পা বাড়াননি। একজন জঙ্গিকেও হত্যা করেননি। এমন অমানবিক, বর্বরোচিত অত্যাচার ও গণহত্যায় কাশ্মীর থেকে উচ্ছেদ হওয়া হতভাগ্য হিন্দুদের জন্য স্বঘোষিত মানবতাবাদীরা একফোঁটা চোখের জল ফেলেনি। অ্যাওয়ার্ড ওয়াপসি গ্যাঙের একজনও নিজের পদক ফেরানোর হুমকি দেয়নি। সেদিন কয়েক হাজার কাশ্মীরি হিন্দু হত্যা, ৬ লক্ষ হিন্দুর গৃহহীন হওয়ার ঘটনা তাদের মনে বেদনার সৃষ্টি করেনি। সেকুলার, বামপন্থী, কংগ্রেসি নেতারা কাশ্মীরি হিন্দুদের থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকার নীতি নিয়ে চলছে। কিন্তু কাশ্মীরে সেনা অভিযানের কথা উঠলেই তারা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধুয়ো তুলছে।

কাশ্মীরের হিন্দুরা যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল, আজ পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি তার থেকে খুব একটা আলাদা নয়। তাই সময় থাকতে তৈরি হতে হবে। বিগত ঘটনা থেকে শিক্ষা না নিলে ভাগ্যকে দোষ দিয়ে কান্নাকাটি করে মাথা চাপড়ানো ছাড়া আর উপায় থাকবে না। মনে রাখতে হবে, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়। যে জাতি ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয় না, সেই জাতির অস্তিত্বই শেষ হয়ে যায়।

—**দেবজ্যোতি পণ্ডিত**
কাঞ্চনতার, মালদা।

প্রত্যেকটি বুথে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রতিনিধি থাকা প্রয়োজন

শুধুমাত্র পাকিস্তানি নাগরিকদের এদেশ থেকে বিতারণ নয়, বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা মুসলমানদেরও এদেশ থেকে বিতারণ করা জরুরি। পশ্চিমবঙ্গের কোনায় কোনায় এরা ভিমরুলের মতো বাসা বেঁধেছে, যেকোনো সময় তারা হুল ফোটানোর জন্য প্রস্তুত। পশ্চিমবঙ্গে এমন অসংখ্য বাংলাদেশি আছে যাদের বাবা-মা এদেশের নাগরিক নয়, অথচ তারা স্বচ্ছন্দে এদেশের নাগরিকত্বের কার্ড তৈরি করে সরকারি চাকরিতে নিযুক্ত। এদের অনেকেই রাজ্য সরকার ও কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থাতে কর্মরত। অত্যন্ত চিন্তার বিষয় যে, এদেশের নিরাপত্তা বিভাগ, প্রশাসনিক বিভাগ এবং বিভিন্ন সরকারি

ফঃ ৩

সংস্থাতে এই বাংলাদেশিরা ঢুকে পড়ায় অভ্যন্তরীণ অনেক তথ্য শত্রুদেশেও চলে যাচ্ছে না তো? এ বিষয়ে কেন্দ্র সরকারের সচেতন হওয়া প্রয়োজন। কেন্দ্র সরকারের কাছে অনুরোধ, অবিলম্বে দেশের প্রতিটি বুথে অন্তত চুক্তি ভিত্তিক একজন করে গোয়েন্দা কর্মী নিয়োগ করা হোক। তারা বুথে নতুন কোনো ব্যক্তির আগমন ঘটলে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরে তথ্য দেবে। ফলে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকে সহজেই চিহ্নিত করা যাবে।

—**কুন্তল চক্রবর্তী**

কলেজরোড, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরগনা।

বাক্‌স্বাধীনতার কি কোনো সীমাবদ্ধতা নেই?

একটি বিষয়ে অনেকেই একমত হবেন যে, আমাদের দেশে কেউ একবার জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হলেই তার বাকস্বাধীনতার কোনো সীমাবদ্ধতা থাকে না। সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশের এক মন্ত্রী ভারতের সেনাবাহিনীর এক উচ্চপদস্থ মহিলা আধিকারিকের ধর্মীয় পরিচয় নিয়ে চরম আপত্তিকর এক মন্তব্য করেন। যদিও পরে তিনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে ক্ষমা চান।

পশ্চিমবঙ্গের এক বর্ষীয়ান জনপ্রতিনিধি ভারতমাতার অতন্দ্র প্রহরী ভারতের সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনীর দ্বারা সংঘটিত 'অপারেশন সিঁদুর'-এর সাফল্য নিয়ে প্রশ্ন তুলে তাদের শুধু অপমানই করেননি বরং বিশ্ব সভায় তাদের অভাবনীয় কৃতিত্বকে কালিমালিপ্ত করেছেন। যেসব নরপিশাচেরা আমাদের নিরীহ মা-বোনেদের সিঁথির সিঁদুর মুছে দিয়েছে, আমাদের অকুতভয় সেনানী নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে। তা সত্ত্বেও তাদের কৃতিত্বকে যারা কালিমালিপ্ত করে তারা কি ভারতের শত্রু নন? পশ্চিমবঙ্গের এক মন্ত্রী দেশের রাষ্ট্রপতির গায়ের রং ও চেহারা নিয়ে প্রকাশ্যে বিকৃত অঙ্গভঙ্গি করে বলেন, 'আমাদের রাষ্ট্রপতির চেহারা কেমন?' তারপরেও তিনি পদে থাকে কীভাবে? পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্য জনসভায় বলেন, 'যে গোরু দুধ দেয় তার একটু লাথি তো সহ্য করতেই হবে।' অর্থাৎ সেই সম্প্রদায়ের মানুষরা হলো দুধেল গাই। তার বক্তব্যে বাকিদের কোনো হেলদোল নেই। তিনি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দলের সর্বভারতীয় সভাপতির পদবি নিয়ে উপহাস করে বলেন, 'নাড্ডা চাড্ডা ফাড্ডা গাড্ডা'। এর চেয়েও বিস্ময়ের হলো, ভারতের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থীকে তিনি প্রকাশ্য জনসভায় বলেছিলেন, 'তোকে কোমরে দড়ি বেঁধে ঘোরাবো', 'হরিদাস পাল,' ইত্যাদি মন্তব্য করে স্বয়ং আত্মপ্রসাদ লাভ করেন।

পশ্চিমবঙ্গের সাংবিধানিক প্রধান রাজ্যপালের বিরুদ্ধে তাঁরই রাজভবনে কর্মরতা এক মহিলা কর্মচারীর আনা মহিলা-সম্পর্কিত অপরাধের কোনো প্রমাণ ছাড়াই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সংবামাধ্যমের কাছে ন্যাকামোর ভঙ্গিতে বলেন, 'না বাবা, আমি আর কখনো একা ওখানে যাব না। ওখানে যা সব কীর্তিকলাপ চলছে। দরকার হলে বাইরে থেকে কথা বলবো।' দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের কাছে আমার করজোড়ে জিজ্ঞাস্য, কেউ কোনোভাবে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হলেই কি তাদের ক্ষেত্রে দেশের রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল, প্রধানমন্ত্রী, বিচারপতি, সেনাবাহিনী, সাধু-সন্ন্যাসীদের যথেচ্ছ তথা অশালীনভাবে অপমান করা যায়? তা কি সংবিধানসম্মত? জনপ্রতিনিধিদের বাকস্বাধীনতার যদি সীমাবদ্ধতা না থাকে তবে দেশ সুরক্ষিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকবে তো? দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ও আইনপ্রণেতারা একটু ভেবে দেখবেন কি?

—**বিনয়কৃষ্ণ দাশ**

উত্তমাশা, বালুরঘাট, দঃ দিনাজপুর।

জঙ্গি আক্রমণে নীরব আর প্রত্যাঘাতে 'শান্তির বার্তা'?

পহেলগাঁও, পুলওয়ামা কিংবা ২৬/১১, যখন জেহাদি আক্রমণে রক্তাক্ত হয় দেশের মাটি, তখন একবারও শান্তির বাণী শোনা যায় না তথাকথিত বাম উদারবাদী সেকু-মাকুদের মুখ থেকে। তখন তাদের কলমে আগুন ঝরে না, তখন তারা মানবতা লঙ্ঘনের কথাও বলেন না। কিন্তু ভারতীয় সেনা যখন প্রত্যাঘাত হানে, শত্রুর ঘাঁটিতে মিসাইল ঝলসে ওঠে, তখন তারা হঠাৎ করে হয়ে ওঠেন বিশ্বশান্তির দূত। তখন যুদ্ধবিরোধী স্লোগানে ভরে তোলেন সোশ্যাল মিডিয়া। আলোচনার মঞ্চে উঠে আসে মানবতা লঙ্ঘনের কথা। কলকাতার রাজপথে তাদের দেখা যায় যুদ্ধবিরোধী মিছিলে পা মেলাতে।

প্রশ্ন হলো, তাদের এই মানবতা কাদের জন্য? যারা ভারতের মাটিকে বারবার রক্তাক্ত করছে, যারা হিন্দু মা-বোনোদের সিঁথির সিঁদুর মুছে দিচ্ছে, তাদের জন্য? যে সেনাবাহিনী অতন্দ্র প্রহরীরূপে সীমান্ত পাহারা দিচ্ছে, শত্রুর গুলির সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়ায়, তাঁদের জন্য এদের একবিন্দু সহানুভূতি নেই। এদের শান্তির বার্তা শুধুই পাকিস্তানি জঙ্গিদের জন্য? এদের আরও ভণ্ডামি হলো, পহেলগাঁওয়ে নৃশংস জঙ্গি হামলার পর এরা প্রশ্ন তুলেছিল, নিরাপত্তা বাহিনী কোথায় ছিল? এরাই আবার জঙ্গিদের ওপর প্রত্যাঘাতের সময়ে বিশ্ব মানবতার প্রতীক হয়ে উঠছেন। তুলছেন যুদ্ধবিরোধী স্লোগান।

পহেলগাঁওয়ে হামলাকারী জঙ্গিদের সঙ্গে হামাসের প্রত্যক্ষ যোগসূত্র স্পষ্ট হয়েছে। প্যালেস্তাইনের এই জঙ্গিরা সন্ত্রাসের মাধ্যমে নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করতে চায়। এরা ভারতের মটিতে রক্ত ঝরানোতেও যুক্ত রয়েছে। এই ভারতেরই কিছু মানুষ যারা হামাসের জন্য চোখের জল ফেলেন, কিন্তু পহেলগাঁওয়ের ঘটনার জন্য এদের হৃদয় কাঁপে না। পরিষ্কার যে এদের দৃষ্টিভঙ্গি একতরফা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এরা কাশ্মীরে, মণিপুরের আজাদির জন্য স্লোগান তোলেন। কিন্তু কাশ্মীর থেকে, বাংলাদেশ থেকে হিন্দুরা বিতাড়িত হলে নীরব থাকেন। এরা প্রতিবাদ করেন বেছে বেছে। এটা তাদের কোনো মানবতাবাদ নয়, এটা ভারতের জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো একপ্রকার আত্মঘাতী প্রবণতা।

—**দিগন্ত চক্রবর্তী**

জাঙ্গিপাড়া, হুগলী।

ভারতীয় নারীর অবিস্মরণীয় অবদান কি আজ লুপ্তপ্রায় ?

তনুশ্রী নাথ দাস

দূরদর্শন বা দৈনিক সংবাদপত্রের দিকে লক্ষ্য করলেই নিত্যদিন বর্ণনাতীত নারী নির্যাতনের বীভৎস ঘটনাবলী আমাদের মনকে ক্ষত-বিক্ষত করে। একশ্রেণীর নররূপী দানব তাদের উদগ্র বাসনাকে চরিতার্থ করার জন্য দু' বছরের শিশুকন্যা থেকে শুরু করে ৮০ বছরের বৃদ্ধা কাউকেই রেহাই দিচ্ছে না। এর জন্য মূলত তিনটি বিষয় দায়ী। ১. ইন্দ্রিয়-সুখ-সর্বস্ব পাশ্চাত্য সভ্যতার বিষাক্ত ছোবল। ২. প্রশাসনিক সক্রিয়তার অভাব। ৩. উপযুক্ত শাস্তির ব্যাপারে বিচার বিভাগের দীর্ঘসূত্রিতা। অথচ আমাদের সমাজ-সংসারকে সাবলীল গতিতে চালিত করার পেছনে মাতৃজাতির অভাবনীয় অবদানকে আমরা ক'জন তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা দিই! একজন নারীর প্রথম পরিচয় তিনি মঙ্গলময়ী-স্নেহময়ী-গর্ভধারিণী জননী তথা সৃষ্টির অবিরল ধারা বহনকারিণী। কখনো তিনি স্নেহশীল ভগ্নী, কখনো-বা তনয়া। তিনি স্বামীর ছায়াসঙ্গিনী, অনুপ্রেরণা দাত্রী, সন্তানের পালনকর্ত্রী, গুরুজনদের শুশ্রূষাদায়িনী আলোকেবর্তিকা সম। অতিথি অভ্যাগতদের কাছে সহাস্য বদনা সেবার প্রতিমূর্তি।

কীভাবে একজন মা তাঁর সংসারকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে গড়ে তুলছেন তা যদি সংক্ষেপে মূল্যায়ন করা যায়, তাহলে দেখা যাবে একজন মা কখনো তিনি সেবিকা (নার্স), কখনো তিনি সুইপার (হাসিমুখে সন্তানের মল-মূত্র-ক্লেদাদি পরিষ্কার করছেন), কখনো তিনি ধোপানি, ঝাড়ুদার, গৃহকর্ত্রী, হিসাবরক্ষক, স্বামীর অনুপ্রেরণা তথা পরামর্শদাত্রী। এখন এই ভূমিকাগুলির প্রত্যেকটিকে যদি অর্থের মাপকাঠিতে মূল্যায়ন করা যায় তবে কি তার গুরুত্ব অপরিসীম নয়? তবু ক'জন মা এই সমাজে তার যথার্থ মর্যাদা পান? তার উপরে তিনি যদি কোনো প্রকার আর্থিক জীবিকার সঙ্গে যুক্ত থাকেন— তবে তো কথাই নেই। তথাপি মাতৃজাতি এ সমাজে আজও অবহেলিতা।

এই হলো আজকের সমাজে মাতৃজাতির অবস্থান। কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'নারী' কবিতা লিখেছেন—

'বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।'

এতক্ষণ ভারতভূমির মাতৃজাতির যে অবদান তুলে ধরবার চেষ্টা করা হলো—চলমান সমাজে মা-বোনেরা কি তাঁদের সেই মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন? স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন— "তুমি বিশ্বের যে কোনো দেশে চাইলেই শয্যাসঙ্গিনী পাবে, কিন্তু 'মা' পেতে হলে একমাত্র ভারতবর্ষেই পাবে।"

স্বামীজীর সেই অঘোষ বাণীর মর্যাদা কি চলমান সমাজে মা-বোনেরা অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন? না, পারেননি। এখন এই ভারতভূমির যত্রতত্র প্রতিদিন যত নারী নির্যাতিতা হচ্ছেন তার বেশিভাগ ক্ষেত্রে কোনো না কোনো নারীর ভূমিকা প্রায় নিশ্চিত। অর্থাৎ নারীরাই নারীদের শত্রু। 'নারী-প্রগতি' বা 'নারী স্বাধীনতার' নামে অন্ত:সারশূন্য ভোগসর্বস্ব পাশ্চাত্য সভ্যতার বিষাক্ত ছোবলে ভারতের সনাতন নারী সমাজের একাংশ আজও পাপের পঙ্কিলে নিমগ্ন! তারা স্বল্পবাস পরে আকণ্ঠ মদ্যপান করে জ্বলন্ত সিগারেট হাতে বয়ফ্রেন্ডদের কণ্ঠলগ্না হয়ে বিকৃত ভঙ্গীতে হোটেল রেস্তোঁরায় গভীর নিশি যাপন করছেন। তাঁরাই আবার ভারতের সনাতন সংস্কৃতিকে ব্যঙ্গ করে নিজেদের হাইফাই লাইফ-স্টাইলের জয় গানে মুখরিত।

এ ব্যাপারে বিভিন্ন মহিলা সমিতির নেত্রীরা নিজ নিজ পদে আসীন থাকার স্বার্থে এবং বুদ্ধিজীবী সমাজ 'ভিমরুলের চাকে ঢিল ছোড়ার' পরিণতি চিন্তা করে 'স্পিকটি নট'। এ ব্যাপারে তাঁদের কিছু বলতে গেলে তাঁরা হয়তো ভাবগম্ভীর কণ্ঠে বলবেন, 'ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারও নেই।' 'সতীত্ব, পতিব্রতা, দৈহিক পবিত্রতা' এই শব্দগুলোর স্থান হয়েছে এখন শুধুমাত্র শাস্ত্র-গ্রন্থে। বাস্তবে এই শব্দগুলি সম্বন্ধে এ সমাজের কজন মা-বোন ভাবেন--- সে ব্যাপারে মন্তব্য না করাই ভালো। শুধু এটুকুই বলা যেতে পারে— প্রাচুর্যের অভিশাপে মানব জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য খুঁজে না পেয়ে যেসব মেম সাহেব একসময়ে 'বিকিনি' পরে বিকৃত ভঙ্গিতে সমুদ্র-সৈকতে বিহার করেছেন, তাদের একাংশ কিন্তু আজ মস্তক-মুণ্ডন করে মৃদঙ্গ আর করতাল নিয়ে মধুর কৃষ্ণনামে মাতোয়ারা। অর্থাৎ তাঁরা জীবনের দিশা খুঁজে পেয়েছেন।

প্রাচীনকালের সতী-সাবিত্রী-অপালা-গার্গী-মৈত্রেয়ী- লোপামুদ্রা- অরুন্ধতী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া মায়েদের কথা বাদ দিলেও ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর যে স্বনামধন্যা মায়েরা বিভিন্ন বিষয়ে যেসব অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন সেগুলো কি ইতিহাসের পাতায় আবদ্ধ থেকে শুধুই গুমরে গুমরে কাঁদবে!

ভারতের সনাতনী মা-বোনেরা এবিষয়ে একটু ভাবুন! □

গরমে শিশু ও বাচ্চাদের খাদ্য তালিকার দিকে নজর রাখতে হবে

দিতি ভট্টাচার্য

সন্তান মানেই প্রত্যেক অভিভাবকের কাছে যত্নের জায়গা, আদর যত্নে লালিত প্রাণ। গরমে সঠিক পুষ্টি বজায় রাখার জন্য এবং বিভিন্ন রকম অসুখের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সঠিক খাদ্য তালিকায় খুব জরুরি। শিশুর দ্রুত বেড়ে ওঠার জন্য অবশ্যই খাবারের মান সঠিক পুষ্টিসমৃদ্ধ হতে হবে। বাড়ির ছোটোদের জন্য নিতে হবে বাড়তি যত্ন। এই গরমে শিশুদের সুস্থ ও প্রাণবন্ত রাখতে খাদ্য তালিকায় পরিবর্তন আনা জরুরি।

৬ মাস পর্যন্ত শিশুর একমাত্র খাবার মায়ের স্তন্যদুগ্ধ। এই কারণে এই সময়ে মাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল ও পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে। যে সব শিশু যেকোনো কারণেই হোক স্তন্যপান করে না, তাদের নির্দিষ্ট পরিমাণ মতো ফর্মুলা দুধ তৈরি করে দিতে হবে। অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে শরীরে যেন জলের ঘাটতি না হয়।

শিশু বা একটু বড়ো বাচ্চাদের পর্যাপ্ত হাইড্রেশন এবং সঠিক পুষ্টি তাদের বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য। বিশেষ করে গ্রীষ্মের মাসগুলোতে। তাপ ও বর্ধিত শারীরিক কার্যকলাপের সংমিশ্রণে পুষ্টির মান ব্যাহত হতে পারে। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিন্তু নীতি মেনে চললে পুরো গরমকাল বাচ্চারা সুস্থ, সবল ও নীরোগ থাকবে।

● গরমে শিশুকে হালকা টাটকা ও পুষ্টিকর খাবার দিতে হবে।

● সকালে ঘুম থেকে উঠেই এক গ্লাস জল খাওয়ানো কার্যকরী।

● শিশুর দৈনিক খাদ্য তালিকায় মৌসুমি রসালো ফল রাখা যেতে পারে। যেমন তরমুজ, আম, পেয়ারা, কলা ইত্যাদি। এতে রয়েছে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট, ভিটামিন, মিনারেলস, খনিজ উপাদান, ক্যালসিয়াম, ফাইবার ইত্যাদি, যা বাচ্চাদের দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। মস্তিষ্কের ও পেশির কার্যকারিতা, হজম শক্তি ও মুখের রুচি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

● গরমে তৃষ্ণা ও ক্লান্তিভাব মেটাতে ফলের শরবতের জুড়ি নেই। তাই বাচ্চাদের গরমে বিভিন্ন ফলের শরবত দেওয়া যেতে পারে। এতে তাদের শরীর ঠাণ্ডা রাখতে সাহায্য করবে। ফলের শরবতের মধ্যে লেবুর শরবত, বেলের শরবত অন্যতম।

● প্রতিদিন এক গ্লাস লবণ-চিনির জল উপযোগী। দিতে পারেন ডাবের জল, আখের রস।

● বাচ্চাদের খাবারে পর্যাপ্ত পরিমাণে শাকসবজি রাখতে হবে। যেমন পেঁপে, মিষ্টিকুমড়ো, করলা, টমেটো, লাউ, লালশাক, পুঁইশাক ইত্যাদি অন্যতম।

● শশায় প্রায় ৯৬ শতাংশ জল থাকে। এটি রোজ খাদ্যতালিকায় রাখা উপকারী।

● শাকসবজি, ফলমূল প্রভৃতি খাবারের সঙ্গে মাছ মাংসও রাখতে হবে। পরিমাণমতো বাচ্চাদের দিতে হবে প্রোটিন।

● প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করতে প্রতিদিন একটি করে ডিম সেদ্ধ দেওয়া যেতে পারে।

● বাটারমিল্ক বা ঘোল ক্যালসিয়াম ও প্রোটিন সমৃদ্ধ।

● প্রতিদিনের রুটিনে অবশ্যই রাখবেন প্রচুর জল। এগুলোর পাশাপাশি যে খাবারগুলো বা যে অভ্যাসগুলো বাচ্চাদের জন্য খারাপ সেগুলো হলো :

● অতিরিক্ত তেল-মশলাযুক্ত খাবার, ফাস্টফুড।

● জল না খাওয়া, খাবার না খাওয়া।

● চিপস, কোল্ড ড্রিংকস ইত্যাদি।

● বাসি খাবার, বাইরের খাবার।

এই সময়ে :

● রেস্তরাঁর খাবার কিংবা ভাজা খাবার এড়িয়ে চলুন।

● বাচ্চার টিফিন বাইরে থেকে না কিনে চেষ্টা করুন বাড়ি থেকে স্বাস্থ্যকর কিছু দিতে, যেমন স্যান্ডউইচ সঙ্গে ফল।

● রং বিহীন আইসক্রিম দেওয়া যেতে পারে।

গ্রীষ্মকালে এরকমই কিছু জিনিস বাচ্চাদের ডায়েটে মেনে চললে গরমের তাপপ্রবাহ থেকে শিশু ও বাচ্চা সুস্থ থাকবে এবং গ্রীষ্মকালীন রোগ যেমন বদহজম, পেটের সমস্যা, জলের ঘাটতি-সহ একাধিক রোগপ্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে।

(লেখিকা একজন পুষ্টিবিদ)

প্লাস্টিক— পরিবেশ রক্ষার ভয়ংকর বিপদ

অনিকেত বৈশ্য

বর্তমান বিশ্বে প্লাস্টিক একটি অপরিহার্য উপাদান হয়ে উঠেছে। দৈনন্দিন জীবনের প্রায় সব ক্ষেত্রেই এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়— প্যাকেজিং, বাসনপত্র, ইলেকট্রনিক্স, চিকিৎসা, কৃষি ইত্যাদি। কিন্তু এই বহুল ব্যবহৃত বস্তুটি আজ বিশ্বজুড়ে পরিবেশ দূষণের অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্লাস্টিক দূষণের পরিসংখ্যান :

জাতিসঙ্ঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP) ২০২৩ সালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রতি বছর বিশ্বে প্রায় ৪০ কোটি টন প্লাস্টিক উৎপাদিত হয়, যার মধ্যে ৫০ শতাংশ একবার ব্যবহারযোগ্য (single-use plastic)। এর মধ্যে মাত্র ৯ শতাংশ প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহার করা হয়, ১২ শতাংশ দাহ্যকরণ করা হয় এবং বাকি ৭৯ শতাংশ প্লাস্টিক আবর্জনার ভাগাড়ে জমা থাকে বা সরাসরি প্রকৃতিতে মিশে যায় (UNEP, 2023)। ভারতে প্রতি বছর গড়ে ৩.৪ মিলিয়ন টন প্লাস্টিক বর্জ্য উৎপন্ন হয় (CPCB, 2022)।

পরিবেশের উপর প্রভাব :

প্লাস্টিক প্রকৃতিতে সহজে পচে না। এক একটি প্লাস্টিক ব্যাগ বা বোতল পচতে ৪০০-১০০০ বছর পর্যন্ত সময় লাগে। এই দীর্ঘস্থায়িত্বের কারণে প্লাস্টিক ভূমি, নদী, হ্রদ ও মহাসাগরে জমে থেকে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। সামুদ্রিক পরিবেশে প্রতি বছর প্রায় ৮০ লক্ষ টন প্লাস্টিক বর্জ্য প্রবেশ করে, যার ফলে সামুদ্রিক প্রাণী, পাখি ও মাছের মৃত্যু ঘটে বা তাদের খাদ্য শৃঙ্খলে বিঘ্ন ঘটে (Jambeck et al., 2015)।

মাইক্রোপ্লাস্টিক নামে পরিচিত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্লাস্টিক কণা এখন বাতাস, জল ও খাবারের মধ্যেও প্রবেশ করছে। গবেষণায় দেখা গেছে, একজন মানুষ গড়ে প্রতি সপ্তাহে ৫ গ্রাম মাইক্রোপ্লাস্টিক গ্রহণ করছে, যা একটি ক্রেডিট কার্ডের ওজনের সমান (WWF, 2019)। এটি মানবদেহে ক্যানসার, হরমোনজনিত সমস্যা, প্রজননের সমস্যা ইত্যাদির কারণ হতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তনে ভূমিকা :

প্লাস্টিক উৎপাদনের প্রক্রিয়া মূলত জীবাশ্ম জ্বালানি নির্ভর, যার ফলে প্রচুর পরিমাণে কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গত হয়। অনুমান করা হয়, ২০৫০ সালের মধ্যে প্লাস্টিক শিল্প এককভাবে গ্লোবাল গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমণের প্রায় ১৩ শতাংশ ভূমিকা রাখবে যদি বর্তমান প্রবণতা অব্যাহত থাকে (Center for International Environmental Law, 2019)।

সমাধান এবং ভবিষ্যৎ উদ্যোগ :

প্লাস্টিক দূষণ মোকাবেলায় ব্যক্তিগত, সামাজিক ও নীতিগত স্তরে একসঙ্গে কাজ করা প্রয়োজন। কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হতে পারে :

- **Reduce (হ্রাস) :** প্লাস্টিক ব্যবহারে সংযম।
- **Reuse (পুনর্ব্যবহার) :** একবার ব্যবহৃত প্লাস্টিক পুনরায় ব্যবহার।
- **Recycle (পুন:চক্রায়ন) :** প্লাস্টিক সংগ্রহ করে নতুন পণ্যে রূপান্তর।
- **বিকল্প উপাদান :** জুট, কাগজ, গাছ-ভিত্তিক বায়োপ্লাস্টিক ব্যবহার।

ভারত সরকার ২০২২ সালে ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক নিষিদ্ধ করেছে, যা একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। তবে বাস্তবায়নে কঠোরতা ও সচেতনতা বাড়ানো দরকার। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গণমাধ্যমের মাধ্যমে সচেতনতা বাড়ানো অত্যন্ত জরুরি।

উপসংহার :

প্লাস্টিক আধুনিক জীবনের উপযোগিতা বাড়ালেও, এটি পরিবেশের জন্য মারাত্মক বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবী রেখে যেতে হলে এখনই প্লাস্টিক ব্যবহারে সচেতন ও দায়িত্বশীল হওয়া দরকার।

তথ্যসূত্র :

• UNEP (2023). *Turning Off the Tap : How the World Can End Plastic Pollution.* • CPCB (2022). *Annual Report on Plastic World Can End Plastic Pollution.* • Jambeck, J. et al. (2015). *Plastic waste inputs from land into the ocean, Science.* • WWF (2019). *No Plastic in Nature : Assessing Plastic Ingestion from Nature to People.* • CIEL (2019). *Plastic & Climate : The Hidden Costs of a Plstic Planet.*

প্রকৃতি রক্ষতি রক্ষিতঃ

সোমকান্তি দাস

গাছকে সন্তানস্নেহে বড়ো করে চলেছেন, তাদের ছায়ায় বসে তাদের সঙ্গেই গল্প করে সময় কাটাচ্ছেন লক্ষাধিক সন্তানের মা কর্ণাটকের তুলসী গৌড়া। আবার রাজস্থানে কন্যাসন্তান জন্ম হওয়ায় তৈরি হয়েছে ১০০টি গাছ লাগানোর অভিনব পরম্পরা। বিষ্ণোই সমাজের অমৃতাদেবীর নেতৃত্বে অরণ্যরক্ষায় ৩৬৩ জন আত্মবলিদান দিয়েছেন। উত্তর প্রদেশে চিপকো আন্দোলন গড়ে ওঠেছে অরণ্য রক্ষার্থে। সারা দেশে এমন উদাহরণ আছে যেখানে সাধারণ মানুষ বা গোষ্ঠী নিজেদের সময় ও অর্থ ব্যয় করে চলেছে পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য। পরিবর্তে জুটেছে গাছপাগল, গাছবুড়ো প্রভৃতি উপনাম। কিন্তু প্রকৃতির প্রতি নিজ কর্তব্যে বিন্দুমাত্র ছেদ পড়েনি।

যখন বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে সারা বিশ্ব চিন্তাগ্রস্ত, তখন সমস্যার সমাধানে উঠে এসেছে ভারতের নাম। প্রাচীন পরম্পরাকে টিকিয়ে রেখে প্রকৃতির সংরক্ষণের যে প্রক্রিয়া প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে তা বিশ্ব আজ মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। প্রত্যন্ত গ্রামের নিরক্ষর মানুষটিও জানেন সেই পরম সত্যকে। প্রকৃতিকে শোষণ নয়, দোহন করে যতটা প্রয়োজন ততটুকুই ব্যবহার করা ভারতীয় সংস্কৃতির অভিন্ন অঙ্গ। আয়ুর্বেদিক বৈদ্যরা চিকিৎসার জন্য পাতা, বাকল বা মূল সংগ্রহের সময় সেই গাছের অনুমতি চেয়ে নেন এবং একটি গাছে হাত দেওয়ার আগেই কয়েকটি চারা রোপণ করেন। এখনো প্রতিটি হিন্দুবাড়িতে অন্তত একটি তুলসীগাছে নিত্য জল দেওয়ার পরম্পরা রয়েছে। কোথাও তার সঙ্গে ফনীমনসা বা বট-অশ্বত্থ পূজারও প্রচলন রয়েছে। একেক পূজায় একেক রকমের ফুল-ফল-পাতার প্রয়োজন হয়। আজও দুর্গাপূজা নবপত্রিকা পূজা ছাড়া অসম্পূর্ণ। তেমনই অপরাজিতা পূজা। গ্রীষ্মের দাবদাহ থেকে রক্ষা করতে অরণ্যই একমাত্র রক্ষাকর্তা। তাইতো জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল ষষ্ঠীতে অরণ্যষষ্ঠী পালনের মাধ্যমে গাছেরই পূজা করা হয়।

আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস, শরীর ধারণে সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির উপর আমরা নির্ভরশীল। অসুস্থ শরীরের জন্য হাসপাতালে গিয়ে প্রাণবায়ুকেও কিনে নিতে হয়। বহু শহরে খোলা বাতাসে শ্বাস নিতেও লোকে ভয় পাচ্ছে। হিন্দু সংস্কৃতিতে জলদান মহাপুণ্যের কাজ। কিন্তু জলসংকট ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। পৃথিবীর তিনভাগ জল থাকা সত্ত্বেও পানীয় জল কিনে নিতে হয়। কিন্তু আর কতদিন? যে গতিতে ভূগর্ভস্থ জলের সঞ্চয় কমে যাচ্ছে, তাতে শুধুমাত্র পানীয়জলের জন্যই যুদ্ধ শুরু হবে একদিন। ভারতের বেশ কিছু রাজ্যে চরম জলসংকট দেখা দিয়েছে।

প্রকৃতির সঙ্গে এই যে একাত্মভাব তা কোনো পুঁথিগত বিদ্যায় আসতে পারে না। আজ যারা নিজেদের শিক্ষিত বলে দাবি করছেন, তাঁরাই পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী। নিজেদের স্বার্থে জঙ্গল কেটে বিলাসবহুল রিসর্ট, হোটেল, পার্ক তৈরি চলছে। সম্প্রতি তেলেঙ্গানাতে অরণ্য ধ্বংস করার ঘটনা সকলের নজরে এসেছে। রাতের অন্ধকারে ময়ূরের চিৎকার করে কান্না, হরিণের এদিক ওদিক ছুটে চলা, নিজের বনভূমি রক্ষায় এক হাতিকে জেসিবিতে ধাক্কা মেরে চরমভাবে ক্ষতবিক্ষত হওয়া— সংবাদ শিরোনামে স্থান পেয়েছে। বহু রাজ্যে, বহু দেশে এমন অজস্র ঘটনা ঘটে চলেছে।

কুড়ি-পঁচিশ বছর আগেও রাস্তার দুধারে পুরনো শিমুল, বট, অশ্বত্থ, কৃষ্ণচূড়া প্রভৃতি গাছ চোখে পড়ত। আজ সেই দৃশ্য পুরনো ছবির অ্যালবামে খুঁজে দেখতে হবে, বাস্তবে তা হারিয়ে গেছে। কিছু গাছপাগল মানুষ চেষ্টা করে যাচ্ছেন সেই রূপকে ফিরিয়ে আনতে। নিজেদের কাজের ফাঁকে বা কাজের সঙ্গেই সাইকেলে বা বাইকে, পায়ে হেঁটে, কখনো দল বেঁধে বা কখনো একাই রোদ-ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে গাছ লাগিয়ে চলেছেন। নিয়মিত সেইসব গাছের পরিচর্যা করছেন। কেউ নিজের বাড়িতেই সাজিয়ে তুলছেন ছোট্ট বাগান। বাড়ির ছাদে গড়ে তুলছেন ছাদবাগান। কোথাও ছোট্ট একটা ঔষধি বাগান।

এই সব মানুষ শুধুমাত্র ফল বা ফুলের জন্য এসব করেন না। এসব করেন প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা ও কর্তব্যবোধ থেকে। যখন গাছে নতুন ফুল-ফল আসে তখন প্রজাপতি, মৌমাছি, কত পাখি এসে জোটে। এই দৃশ্য যে অভাবনীয় আনন্দ দেয়, তা বর্ণনাতীত। প্রকৃতি সমস্ত প্রাণীকে সন্তানস্নেহে লালনপালন করে চলেছে, তাই তাকে রক্ষা করাটা যে সকলের কর্তব্য। প্রকৃতিকে রক্ষা করলে প্রকৃতিও সকলকে রক্ষা করবে। □

জীবজগৎ রক্ষায় পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ হলো একমাত্র বিকল্প

অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায়

সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিরন্তর এগিয়ে চলেছে মানব সভ্যতা। এককালে অরণ্যানীর অভ্যন্তরে বিকশিত হয়েছিল প্রাচীন সভ্যতা। পরবর্তী পর্যায়ে জীবন-জীবিকার সুবিধার্থে নদী তীরবর্তী অঞ্চলে গড়ে ওঠে সভ্যতা। সেই সভ্যতার রূপটি ছিল আরণ্যক। পরবর্তীকালে সভ্যতার ক্রমোন্নতির ধারা বেয়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে উঠতে থাকা শহর, জনপদ ও জনবসতিগুলির চরিত্র পরিবর্তিত হতে থাকে। তৈরি হতে থাকে মহানগর, শিল্পাঞ্চল। নানাভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ উত্তোলন এবং তার ব্যবহার হয়ে ওঠে মানব সভ্যতার উন্নতির সোপান। বিগত কয়েকশো বছরে তা এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। নির্বিচারে প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস এবং তার বিনিময়ে এক-একটি দেশের জিডিপি বৃদ্ধিই যেন হয়ে উঠেছে বিশ্ব অর্থনীতির জিয়নকাঠি- মরণকাঠি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ শেষ হয়ে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের সূত্রপাত ঘটে। অর্থনীতি পরিচালনা, ব্যবসাবাণিজ্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে ধনী দেশগুলি গরিব ও উন্নয়নশীল দেশগুলির উপর চাপিয়ে দিতে থাকে নানা চুক্তি ও শর্ত। কিন্তু গরিব দেশগুলি ছিল নানা প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ। সেই দেশগুলিতে বশংবদ সরকার ও প্রশাসক বসিয়ে দেশগুলির সম্পদ লুঠ করতে থাকে উন্নত দেশগুলি। প্রতিটি দেশের বনজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ, জলসম্পদের উপর চাপ সৃষ্টি হতে থাকে। এর সঙ্গে নানা শিল্পবিকাশের দরুন পরিবেশ দূষণ মাত্রাছাড়া আকার ধারণ করে। কৃষিক্ষেত্রে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার, পরিবহণ ক্ষেত্রে পরিবেশ-বান্ধব জ্বালানি ব্যবহৃত না হওয়া, সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে প্লাস্টিকের ব্যবহার, প্রতিটি শিল্পাঞ্চলের বর্জ্য নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নির্মিত না হওয়া, শিল্পাঞ্চলগুলি থেকে প্রতিনিয়ত নানা ক্ষতিকর গ্যাস নিঃসরণ, বিশ্বজুড়ে পরিবেশবিধি কঠোরভাবে বলবৎ না হওয়া, ফোন ও ইন্টারনেট পরিষেবা প্রদানের জন্য টাওয়ার স্থাপন, তড়িৎ-চুম্বকীয় বিকিরণ এবং ব্যাপক হারে অরণ্য ধ্বংস জল-মাটি-বায়ুকে করে তুলেছে বিষাক্ত। ফলে হয়ে চলেছে 'গ্লোবাল ওয়ার্মিং', 'ক্লাইমেট চেঞ্জ'। বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পৃথিবী ধীরে ধীরে যেন হয়ে উঠছে মানুষের বসবাসের অযোগ্য। ব্যাপক হারে কার্বন নিঃসরণের কারণে ওজোনস্তরের ফাটল বৃদ্ধি পাচ্ছে। বেড়ে চলেছে বিশ্বের গড় তাপমাত্রা। মেরুপ্রদেশের বরফ দ্রুত গলে যাচ্ছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অরণ্য ও বাসস্থান ধ্বংসের কারণে বিলুপ্ত হচ্ছে নানা প্রাণী ও উদ্ভিদ। বিপন্ন হচ্ছে প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্র। আবহাওয়া হয়ে উঠছে খামখেয়ালি। কোথাও অনাবৃষ্টি, কোথাও সাইক্লোন, কোথাও বন্যা, তো কোথাও ভূমিকম্প। পরিণামস্বরূপ মানব সম্পদ হানি, ফসল হানি ইত্যাদি। ভূগর্ভস্থ জলসম্পদের মাত্রাতিরিক্ত উত্তোলনের ফলে পৃথিবীর ঘূর্ণন অক্ষ পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়েছে। সম্প্রতি সংঘটিত একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রকাশিত হয়েছে যে, ১৯৯৩ থেকে ২০১০-এর মধ্যে পৃথিবী পূর্বদিকে প্রায় ৮০ সেন্টিমিটার (৩১.৫ ইঞ্চি) হেলে পড়েছে।

এহেন সংকটজনক পরিস্থিতিতে বিশ্ব জুড়ে প্রকৃতি, বাস্তুতন্ত্র ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানীরা দুটি প্রক্রিয়া অবলম্বনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে চলেছেন। ২০২১ সালের ৫ জুন (বিশ্ব পরিবেশ দিবসে), ২০২১ থেকে ২০৩০ পর্যন্ত চলমান দশকটিকে 'ইউএন ডিকেড অন ইকোসিস্টেম রেস্টোরেশন' বা 'বাস্তুতন্ত্র রক্ষার দশক' হিসেবে ঘোষণা করেছে রাষ্ট্রসঙ্ঘ। এই ঘোষণাপত্রে 'ইকোরেস্টোরেশন' (বাস্তুতন্ত্রের ক্ষয় ও বিকৃতি রোধ) ও 'বায়োরেমেডিয়েশন' (জৈবিক প্রতিকার)-এর প্রক্রিয়ার বিষয়টির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধের ক্ষেত্রে এই কালখণ্ডটিই মানবজাতির কাছে শেষ সুযোগ বলে ঘোষণা করেছেন আন্তর্জাতিক স্তরের বিজ্ঞানীরা।

ইউনাইটেড নেশনস্ এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম এবং ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশন কর্তৃক প্রকাশিত নির্দেশাবলীতে অরণ্যভূমি, তৃণভূমি, কৃষিজমি, নদী, জলাভূমি, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র (প্রবাল-প্রাচীর), সমুদ্র উপকূল (ম্যানগ্রোভ অরণ্য) প্রভৃতি বাস্তুতন্ত্রকে সংরক্ষণের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের একাদশতম শ্লোকে শ্রীভগবান বলেছেন, 'দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ। পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ।।' এটিই হলো প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সনাতনী ধারা। আত্মোন্নতির স্বার্থে প্রতিযোগিতা ও প্রকৃতি ধ্বংসযজ্ঞের পরিবর্তে বিশ্বে বিরাজমান সব জীবের মধ্যে সুসংহত সম্পর্ক এবং পরস্পরের প্রতি সহযোগিতার বাণী উচ্চারণ করেছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। নদী, জল, মাটি, বন্যপ্রাণ, পর্বত, অরণ্য, বৃক্ষরাজিকে পবিত্র জ্ঞান করে আবহমানকাল ধরে পূজা করে চলেছে ভারতবাসী। এরই মাধ্যমে হয়ে চলেছে প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষার সাধনা। প্রকৃতিকে শোষণের পরিবর্তে 'দোহন'-এর মাধ্যমে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের সন্ধান ও প্রাপ্তিই হলো ভারতীয় গ্রোথ মডেল। প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংসের দ্বারা জিডিপি-কেন্দ্রিক, পাশ্চাত্যধর্মী আর্থিক উন্নয়নের পরিবর্তে ভারতীয় পদ্ধতি ও চিন্তাধারা অনুসরণে অর্থনীতি পরিচালনার মাধ্যমে বিশ্ব-পরিবেশ রক্ষাই হোক আগামীদিনে বিশ্ববাসীর সংকল্প। ■

ভারতবোধ ও প্রকৃতি সংরক্ষণ এক সূত্রে আবদ্ধ

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

বৈদিক ঋষিদের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল, 'ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ।। মধু নক্তমুতোষসি মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা।।' মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমানস্তু সূর্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।। (বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৬।৩।৬)

অর্থাৎ বায়ু নদী মধুময় হোক। মধুময় হোক ওষধিসকল, দিন রাত্রি মধুময় হোক। মধুময় হোক ভূলোক এবং পিতৃস্থানীয় দ্যুলোক। (বেদ, মধুমতীসূক্তম)। এ হলো প্রকৃতিপ্রেম এবং পরিবেশ ভাবনার নিবিড় ভাব। একুশ শতকের পৃথিবী— কত উত্তেজনা, প্রশ্ন উত্তর, সমস্যা সমাধান। বিষয় একটাই, পরিবেশ চেতনা। প্যারিস কনভেনশন থেকে জি-২০ সামিট— সর্বত্র পরিবেশ চর্চা। সময়ের গ্রাসে মানুষের বিপুল লোভে এই পৃথিবী দূষিত। নৈতিকতার ঘরে বিপুল অনাচার, তাই পরিবেশ দূষণের মাত্রাটাও তার সাহস বাড়িয়েই চলেছে। যেমন বড়ো বড়ো চর্চা, গবেষণা বিশ্বব্যাপী চলছে, তা অতি অবশ্যই চলুক। যে যত বড়ো বিজ্ঞান প্রযুক্তিই জানুক না কেন, তাকে মাথা নত করতেই হবে ফলিত বিজ্ঞানের কাছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগেও ফলিত বিজ্ঞানের গুরুত্ব, তাৎপর্য, প্রয়োগ, বল, শক্তি বিন্দুমাত্র কমেনি। ঠিক তেমনই পরিবেশ সংরক্ষণের ঘরেও ইনডিজেনাস নলেজ অর্থাৎ দেশীয় ও আঞ্চলিক, নিজস্ব পরিবেশ রক্ষার সংরক্ষণের যে সব আয়োজন, রকমফের আবহমানকাল ধরে চলছে, তা প্রয়োগের ঘরে আরও বেশি সংরক্ষণ দাবি করে।

এইসব ইনডিজেনাস নলেজ অর্থাৎ আঞ্চলিক দেশীয় পদ্ধতির উদ্ভাবকরা এমন নয় যে তারা তপস্বী। তারা দরিদ্র তো কোনো ভাবেই নয়। তাদের নিজস্বতায় ভরপুর এবং অঞ্চল বিশেষে সেই সব দেশীয় পদ্ধতিতে ভর করেই তার আধুনিক রূপসজ্জা কখনো তৈরি হচ্ছে। ভারতের আরও এক মজার ব্যাপার হলো, প্রত্যেক প্রদেশে পরিবেশ রক্ষার যত বিশেষ আয়োজন, পদ্ধতি দেখা যায় তার অধিকাংশই রক্ষা করছে আমাদের জনজাতির মানুষজন। নগরের দূষণ যখন মানবিক সকল সত্তাকে গ্রাস করে তার বিষদাঁত দেখাচ্ছে, তখন গ্রামাঞ্চলের, পাহাড়ের, মরু অঞ্চলের স্থানীয় উপজাতি জনজাতির মানুষরা পরিবেশে ভাবনায় ফলিত বিজ্ঞান প্রদর্শন করছে। মৃত্তিকা সংরক্ষণের অসম্ভব তাগিদ স্বাভাবিকভাবেই সেইসব অঞ্চলে পাওয়া যায়, যেখানে মৃত্তিকা ক্ষয় প্রাকৃতিক ধর্ম। তাই স্বাভাবিকভাবেই মৃত্তিকা সংরক্ষণের অভূতপূর্ব সব পদ্ধতি পাহাড়ি অঞ্চলে বিশেষত উত্তর-পূর্ব ভারতে দেখা মেলে। মৃত্তিকা ও জল সংরক্ষণ অনেক সময়ই যৌথ সংরক্ষণের আওতায় আসে। পৃথক পৃথকভাবে সব প্রদেশের সব দেশীয় সংরক্ষণ রীতি আলোচনার বিস্তর অবকাশ এখানে নেই।

কিছু বিশেষ প্রক্রিয়া উল্লেখ না করলেই নয়। এই ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে, কারণ ইন্টিগ্রেটেড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের রূপকার এই মডেল। যেখানে জল মাটি সংরক্ষণ, মাটি ক্ষয় রোধ, মাছ সংরক্ষণ ইত্যাদি সামগ্রিক বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণের এক নজির তৈরি করেছে। পাহাড়ের নদীগুলিকে প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি টার্শিয়ারি চ্যানেলে বিভক্ত করে তাতে কখনো বাঁধ দেওয়া, কোথাও নির্দিষ্ট আনুপাতিক হিসেবে কৃষিজমিতে সেই জল চ্যানেল পাঠানো, সেই জমিতে বাঁশের বেড়া গঠনের দ্বারা ভূমিক্ষয়রোধ, অতিরিক্ত ভূমিজল ড্রেনের মাধ্যমে নিষ্কাষণ করা, মাঠের মাঝে উলম্ব খাত গঠন এবং সঞ্চিত জলে মাছ চাষ, মাঠে ঋতু বিশেষে চাষ, ফলন, উৎপাদন— এই সামগ্রিক ইন্টিগ্রেটেড কনজারভেশনটিই আপাতনি ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম হিসেবে অত্যন্ত প্রশংসিত। অরুণাচলের মেঠো পাহাড়ি মানুষগুলো লিখিত টেকনিক্যাল বিদ্যা ছাড়াই আবিষ্কারক বুদ্ধিতে কী চমৎকার এক সংরক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগ করে চলেছে।

এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে মেঘালয়ের বাঁশের তৈরি ড্রিপ জল সংরক্ষণ পদ্ধতি। বাঁশের চ্যানেল তৈরির মাধ্যমে পাহাড়ের জল তারা সংরক্ষণ করছে এবং তাতে অতিরিক্ত ভূমিক্ষয়ও রোধ হচ্ছে। মিজোরামের পাহাড়ের খেলা বড়ো অদ্ভুত! পাহাড়ের ঢাল এমনই যে পাহাড়ের মাঝে মস্ত সব খাত। জল ধরার বড্ড সমস্যা। গ্রীষ্মে জলকষ্ট পরিচিত। রুফটপ ওয়াটার হারভেসটিং কোমর বেঁধে ওখানেই শুরু হয়। তারপর তো তা অন্যান্য প্রদেশে জনপ্রিয়তা পেল। এখন তো প্রশিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ার সাজানো-গোছানো বাড়িতে জল ধরার ব্যবস্থা রাখছেন। জল সংরক্ষণের নানান মডেলের সন্ধান আমাদের প্রাচীন হরপ্পা সভ্যতাতেই পাওয়া গেছে। আজ যখন নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় ধোলাবীরা, লোথার্লের জল সংরক্ষণের ছবি দেখছে সারা বিশ্ব, তখনই প্রমাণ পাচ্ছে নগর গঠন ও পরিবেশ চেতনা— যাকে আধুনিক ভাষায় সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট বলে তা সেই প্রাগৈতিহাসিক ভারতে পূর্ণমাত্রায় ছিল।

আধুনিককালে বৃষ্টির জল সংরক্ষণে মহারাষ্ট্রে বান্দারা, মধ্যপ্রদেশে তাল, উত্তরপ্রদেশে বুন্দি, বিহারে আহার ও পাইন, হিমাচলপ্রদেশের কুল, জম্বুর, কান্দি অঞ্চলের পাহাড়ি পুকুর, রাজস্থানে খাদিন, তামিলনাড়ুর এরিস, কর্ণাটকের কাট্টা, কেরালার সুরঙ্গম— নিজ নিজ স্টাইলে স্বতন্ত্র জল সংরক্ষণের বাহবা আদায় করেই ছাড়বে। ১০০ হেক্টরের বেশি আধা শুষ্ক জমি যা আজ কচ্ছের রানে অবস্থিত সিন্ধু সভ্যতার ধোলাবীরা। যে কথা আগেই বলছিলাম। সারা বিশ্ব চমকে গেছে এমন মরু অঞ্চলে এতো

অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে হাজার হাজার বছর আগের সভ্যতা কেমন করে জল সংরক্ষণে চেক ড্যাম, চ্যানেল নেটওয়ার্ক, ভূগর্ভস্থ জল সংরক্ষণ, ১৬টি জলাধার তৈরির মাধ্যমে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ— এতো কিছু! এই ধোলাবীরাই যেন হেঁকে বলছে আজকের সব উন্নত জল সংরক্ষণ প্রণালী প্রকল্পকে, যা আমাদের ভারত সংরক্ষণ বিজ্ঞানে বিশ্বকে দর্শন রূপ দিতে পারে।

নাগাল্যান্ডে ঢালু পাহাড়ে এক মৌলিক পদ্ধতিতে মাটি সংরক্ষণ করা হয়, যার পরিচিত পোশাকি নাম Agriculture with Alnus nepalensis (Alder) tree; এই গাছগুলিকে পাহাড়ের ঢালে লাগানো করা হয়। ৫-৬ বছরের মধ্যে বেশ ভালো বৃদ্ধি পেতেই ডাল-পাতা ছেঁটে তা পুড়িয়ে মাটিতে মিশ্রিত করে সেই মাটিতে চাষ করে। ওই গাছটি মাটির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি করে, আবার ভূমিক্ষয়ও রোধ করে। এছাড়াও জ্যাবো পদ্ধতিতে জল-ভূমি-অরণ্য সংরক্ষণ এক বিশেষ আঞ্চলিক নাগাল্যান্ডীয় বৈশিষ্ট্য বহন করছে। প্রত্যেক কৃষক, পশুপালক ভূমি সংরক্ষকের গ্রামভিত্তিক নিজস্ব দায়িত্ব পালন করে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এই জ্যাবো পদ্ধতি দেখে জেনে আপ্লুত। ইন্টিগ্রেটেড রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের প্রতীক হতে পারে এই জ্যাবো। এতে সয়েল-ওয়াটার কনজারভেশন অর্থাৎ মাটি-জল সংরক্ষণে কনটিউর পদ্ধতি, পারকোলিয়ান ট্যাঙ্ক গঠন, মাটির আর্দ্রতা রক্ষার্থে বিভিন্ন আকৃতির নুড়ি বণ্টনে কস্ট এফেকটিভ পথে সংরক্ষণ ও উৎপাদন দুই-ই সম্ভব।

আজকে পঞ্জাবের হোসিয়ারপুর, রোপার, গুরদাসপুরে উত্তর-পূর্ব ভারতের ইনডিজেনাস নলেজকেই একটু অদলবদল করে প্রয়োগ করা হচ্ছে। হিমাচলপ্রদেশের কাঙ্গড়া, উনা, বিলাসপুর, হামিরপুর, চম্বা, সোলান জেলাতে ভূমিক্ষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের একটি। আইআইটি কানপুর ভারতের পাহাড়ি মানুষের ওই সহজ সরল ও সুন্দর সংরক্ষণ পদ্ধতিগুলিকেই প্রশিক্ষিত প্রয়োগ রূপে এনেছে এবং মৃত্তিকা সংরক্ষণের বৈজ্ঞানিক উপায় কৃষক মহলে বিস্তার লাভ করছে। ফিল্টার স্ট্রিপ অথবা আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় সয়েল মালচিং বা আরথিং আপ, সয়েল কমপ্যাকটিং ইত্যাদি গবেষণাভিত্তিকভাবে আইআইটি কানপুর নিঃসন্দেহে নজির সৃষ্টি করেছে। কিন্তু ওসব তো ফলিত বিজ্ঞান! প্রথম নলেজ কিন্তু সেই নাগাল্যান্ড, মেঘালয় বা এমন কোনো এক মেঠো পাহাড়ি বিদ্যার থেকে আয়ত্ত করে পরবর্তীতে আইআইটি তাকে গবেষণাকক্ষে নবনির্মিত থিয়োরিতে পরিণত করেছে। পাহাড়ের মানুষগুলো সংরক্ষণ বিদ্যার চাবি দিয়েছে, তাকে সাজিয়ে গুছিয়ে বিশ্বের দরবারে পেশ করেছে আইআইটি কানপুর। সংরক্ষণের প্রসঙ্গে ভারতের পূর্বতম প্রান্ত মেঘালয়; পশ্চিমতম প্রান্তের রাজস্থানের বিষ্ণোই জনগোষ্ঠী যেন নিজেই এক মস্ত ইনট্রিগেশন। বিষ্ণোই হিন্দু জনগোষ্ঠীর পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশ প্রেম এবং পরিবেশ সচেতনতা এক বিস্ময়ের অধ্যায়।

সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট পরিবেশ চর্চার অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দাঁতভাঙা জার্নাল পড়ার আগে যেতেই হবে বিষ্ণোইদের গ্রামে। ৫০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে তারা লালনপালন করছে প্রকৃতিকে। বন্যপ্রাণ আবার পৃথক কী? বিষ্ণোই মায়েরাই পৃথিবীকে চেনাল, দেখাল; হরিণ শাবক বিষ্ণোই মায়ের স্তন্যপান করছে। পুঁচকে হরিণ শাবক আপন সন্তানের মতো বড়ো হয় বিষ্ণোই পরিবারে। এইভাবেই প্রতিটি পাখি, পশু, গাছ ও মানুষ সহাবস্থান করছে। ইকোসিস্টেমের সর্বোচ্চ উদাহরণ বিশ্বের বুকে এই বিষ্ণোই জনগোষ্ঠী। প্রকৃতি সংরক্ষণে লড়াই আন্দোলনটাও পৃথিবী শিখল বিষ্ণোইদের থেকেই। আজ থেকে ৩০০ বছর আগে রাজস্থানের মাড়ওয়ার অঞ্চলের এক নারী অমৃতাদেবী বিষ্ণোই-সহ সারা গ্রামের মহিলারা রাজার সৈন্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। গাছ কাটতে দেবে না। গাছ ও প্রাণী থাকবে অক্ষত। বিশ্বের যে কয়টি প্রথম শ্রেণীর সংগঠিত সংরক্ষণ আন্দোলন তার পাকা ইতিহাস গড়েছে তার মধ্যে অমৃতাদেবীর লড়াই ভিন্নতার দাবিদার।

সেদিন অরণ্য সংরক্ষণের দাবিতে ৩৬৩ জন গ্রামবাসী নিহত হন। ইকো ফ্রেন্ডলি রিলিজিয়নের শিরোপা পেয়েছে বিষ্ণোই। ভারতের সংস্কৃতি সব কিছুই সংরক্ষণ করতে শেখায়। ইতিহাস হোক, ধর্ম হোক কিংবা প্রাকৃতিক সম্পদ। সংরক্ষণের ধারক-বাহক বলেই ভারতীয় সংস্কৃতি বিশ্বের চমৎকার বিস্ময়ের বিষয়। বেটার ইন্ডিয়া যখন সর্বত্র নারীশক্তির বন্দনা করছে তখন ফিরে তাকাতেই হয় আমাদের সংরক্ষিত ইতিহাস পাঠাগারে যেখানে লেখা আছে পরিবেশ আন্দোলন হয়েছিল ভারতের মেয়েদের হাত ধরেই। সেদিন সংরক্ষণের জন্য রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ছিল, আর আজকে রাজশক্তি কর্মসূচি করছে প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় পরিবেশ সংরক্ষণের। পরিবেশ সমস্যা এক জ্বলন্ত সমস্যা, সংকটও। মানবজাতির জন্য কখনো কখনো লাল সংকেতও। ভারতের মাথাব্যথা যথেষ্ট। বহু সময়েই মানুষের সচেতনতার যথেষ্ট অভাব দেখা যায়। এমনকী প্রশাসনিক গাফিলতিও অসংখ্য। ভারতের মাটিতে কান পাতলেই শোনা যায় সংস্কৃতির শিক্ষা, ইতিহাস শিক্ষা। যা নিখিল মানবকে পরিবেশ সংরক্ষণের বোধে, জ্ঞানে ঋদ্ধ করতে পারে।

সম্রাট অশোকের দ্বিতীয় শিলালিপিতে এখনো অটুট রয়েছে ভারতাত্মার সচেতনতা 'হরাপিতানি চ রোপাপিতানি চ'--- অর্থাৎ সবুজায়ন করতে হবে। বৃক্ষরোপণ করতে হবে। লুম্বিনী স্তম্ভলিপি পাঠোদ্ধার যেদিন হলো সেদিন সারা বিশ্ব প্রত্যক্ষ করল সম্রাট অশোককে। প্রাচীন ভারত কেবল ধর্ম, যুদ্ধ, হাতি ঘোড়া রথ, রাজশক্তি রাজধর্মে ভরপুর ছিল না, ছিল পরিবেশ রক্ষার বিশ্বস্ত অভ্যাস। ভারতবোধের সঙ্গে প্রকৃতি সংরক্ষণ এক অদ্ভুত শক্তিতে আবদ্ধ। ■

ফ ঃ ৪

রাষ্ট্রবাদী সংগঠনের উদ্যোগে ‘কমলা ভট্টাচার্য্য স্মারক আলোচনা’

গত ১৮ মে কলকাতায় বাগবাজার-স্থিত গৌড়ীয় মঠ অডিটোরিয়ামে ১৯৬১ সালের ১৯ মে শিলচরের বাংলাভাষা আন্দোলন স্মরণে আয়োজিত হয় ‘কমলা ভট্টাচার্য্য স্মারক আলোচনা, ২০২৫’। বৈভবী শাম্ভাবী ফাউন্ডেশন, কাঞ্জিক, নিও ন্যাশনালিস্ট, ভয়েস অফ হিন্দুস্থান এবং হিন্দু সাংস্কৃতিক সঙ্ঘের উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় এদিন আলোচনাসভাটি অনুষ্ঠিত হয়। এ বছর এই আলোচনাসভাটির দ্বিতীয় বর্ষ। এদিনের আলোচনার বিষয় ছিল— ‘ভাষা কি ভাষার শত্রু? বাংলা বনাম হিন্দি’। অনুষ্ঠানের প্রথমপর্বে বাংলাভাষা আন্দোলনের বিষয়টি শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে উত্থাপন করেন বিশিষ্ট আইনজীবী দেবজিৎ সরকার। তাঁর বক্তব্যের পর উদ্যোক্তাদের পক্ষে রাজস্থানের বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব ড. দেশরাজ মীণাকে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। ড. মীণা একজন রাষ্ট্রবাদী নাট্যশিল্পী ও থিয়েটারকর্মী। তিনি রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেছেন। ‘মৎস্য থিয়েটার ফেস্টিভ্যাল’ ও ‘আলোয়ারসঙ্গম মহানাট্যোৎসব’-এর সূচনা তাঁর হাত ধরেই হয়েছে। কোনো সরকারি সাহায্য ব্যতিরেকে কোভিড মহামারী শেষে ২০২২ সালে ৩৭ দিন, ২০২৩ সালে ৭৫ দিন ও ২০২৪-২৫ সালে ১০০ দিন ব্যাপী নাট্যোৎসব তিনি সফলভাবে সম্পন্ন করেছেন। তাঁর আয়োজিত নাট্যোৎসবটি বিশ্বের দীর্ঘতম নাট্যোৎসব। এদিনের আলোচনাসভার প্রারম্ভিক পর্বটি সঞ্চালনা করেন বিশ্ব হিন্দু বার্তার সহ-সম্পাদক ও বিশিষ্ট প্রযুক্তিবিদ সৌগত বসু।

এরপর মূল আলোচনাসভা শুরু হয়। আলোচনাচক্রে উপস্থিত ছিলেন যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজের হিন্দি বিভাগের অধ্যাপিকা ড. মমতা ত্রিবেদী, সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটির স্ট্যাটিস্টিক্স-এর অধ্যাপক ও বিশিষ্ট লেখক অর্ধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের সাধারণ সম্পাদক ও কাঞ্জিকের সম্পাদক অনিমিত্র চক্রবর্তী এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক ও আইনজীবী ওসমান মল্লিক। আলোচনাচক্রে উপস্থিত সকলেই বলেন যে হিন্দি ও বাংলা দুই-ই হলো ভারতীয় ভাষা। মুম্বই ও মাদ্রাজের তুলনায় কলকাতা থেকে দিল্লির নৈকট্যের কারণে, কাশী বা বারাণসী বাঙ্গালিদের দ্বিতীয় আবাসস্থল হওয়ার কারণে হিন্দি ও বাংলা দীর্ঘদিন হাত ধরাধরি করে চলেছে। আলোচনা প্রসঙ্গে উঠে আসে হিন্দি ভাষার বিকাশ ও বঙ্গভূমি জুড়ে এই ভাষার বিভিন্ন পত্রপত্রিকার প্রচার-প্রসারে ভারতীয় নবজাগরণের পুরোধা পুরুষ রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-সহ অসংখ্য বাঙ্গালি মনীষীর অবদানের ইতিহাস। পূর্ব ভারত জুড়ে কোর্ট ল্যাঙ্গোয়েজ হিসেবে হিন্দির প্রচলনে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের অবদানের কথাও স্মরণ করা হয়। বাংলাভাষায় প্রকাশিত অসংখ্য পত্রপত্রিকা পরিচালনার ক্ষেত্রে অসংখ্য হিন্দিভাষী ব্যবসায়ী ও হিন্দি সাহিত্যিকদের অবদানের কথাও বক্তাদের বক্তব্যে উঠে আসে। তাঁরা বলেন যে, বর্তমানে এক শ্রেণীর রাজনীতিক ও ক্ষুদ্র স্বার্থান্বেষী বাংলা-হিন্দির বিভাজনের রাজনীতির মাধ্যমে পূর্ব ভারতের বাঙ্গালি ও অবাঙ্গালি হিন্দু ঐক্য ভাঙতে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। বাংলা ও হিন্দিভাষায় কথা বলা লোকজনকে একে অপরের বিরুদ্ধে তারা লড়িয়ে দিতে চাইছে এবং এই সবকিছুর আড়ালে চাপা দেওয়া চলছে আরব সাম্রাজ্যবাদ, সুচতুরভাবে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে উর্দুকে। বাংলা ও হিন্দিভাষীদের ঐক্য ধ্বংসের এই বিপদ থেকে সকলকে সচেতন থাকার বার্তা এদিনের আলোচনাসভা থেকে দেওয়া হয়। উর্দু, আরবি ও ফার্সি শব্দমুক্ত বাংলা, হিন্দি বলা ও লেখার প্রতিও বক্তারা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। সমগ্র আলোচনাসভা সঞ্চালনা করেন সোমেন সেনগুপ্ত।

লোকপ্রজ্ঞার সাংগঠনিক কর্মশালা এবং অনুভব দর্শন কার্যক্রম

কলকাতার আলিপুরে জাতীয় গ্রন্থাগারে গত ১৪ ও ১৫ মে অনুষ্ঠিত হলো অখিল ভারতীয় প্রবুদ্ধ মঞ্চ প্রজ্ঞাপ্রবাহের পশ্চিমবঙ্গ শাখা লোকপ্রজ্ঞার সাংগঠনিক কর্মশালা এবং একবিংশতিতম অনুভব দর্শন কার্যক্রম। কর্মশালায় উত্তরবঙ্গ, মধ্যবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের ৬০জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন প্রজ্ঞাপ্রবাহের অখিল ভারতীয় সংযোজক ডঃ জে নন্দকুমার, পূর্বক্ষেত্র সংযোজক অরবিন্দ দাশ এবং লোকপ্রজ্ঞার রাজ্য সংযোজক ডঃ সোমশুভ্র গুপ্ত। শ্রীনন্দকুমার ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরার ক্ষেত্রে উন্নমানের গবেষণা ও প্রসারের ক্ষেত্রে দেশের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত 'ইক্ষা (IKSHA) এবং ওই ক্ষেত্রে পিএইচডি এবং পোস্ট ডক্টরাল স্তরে গবেষণাপত্র প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে নির্মিত দীক্ষা (DIKSHA) প্রকল্পের বিষয়ে আলোকপাত করেন। এছাড়াও তিনি প্রজ্ঞাপ্রবাহের নিউজলেটার 'বিচারপ্রবাহ'-এর বিষয়ে সকলকে অবহিত করেন। পরবর্তী কালাংশের কর্মশালায় তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য এবং আনুষঙ্গিক ক্ষেত্রের সৃষ্টি, কার্যকর্তার গুণাবলী ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করেন।

বিকেলে অনুষ্ঠিত হয় লোকপ্রজ্ঞার একবিংশতিতম অনুভব দর্শন কার্যক্রম। মূল বিষয় ছিল **ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরা**। বক্তব্য রাখেন ডঃ জে নন্দকুমার, রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক আবাস ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সম্পাদক স্বামী জ্ঞানলোকানন্দ মহারাজ, খড়্গপুর আইআইটি-র পূর্বতন নির্দেশক ডঃ বীরেন্দ্র কুমার তেওয়ারী এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক সারদাপ্রসাদ পাল। অনুষ্ঠানে লোকপ্রজ্ঞার প্রকাশনা ও প্রচার বিভাগ প্রজ্ঞাভাষ্যের ব্যবস্থাপনায় লোকপ্রজ্ঞার রাজ্য গবেষণা প্রমুখ ডঃ ইন্দ্রজিৎ সরকার রচিত **শতাব্দীর সাধনায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ**, লোকপ্রজ্ঞার মধ্যবঙ্গ প্রান্তের বিমর্শ প্রমুখ ডঃ জয়দেব বিশ্বাস অনূদিত **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি : মহাভারতে যেরূপে প্রকাশিত**। মূল রচনা প্রফেসর এ আর বাসুদেব মূর্তি, ডঃ সত্যনারায়ণ মজুমদার সম্পাদিত **হিন্দুত্ব এক সামগ্রিক বিশ্লেষণ** ও **বিষয়সূত্র** এবং ডঃ সৌমেন ঘোষ রচিত **প্রশ্নোত্তরে ডাঃ হেডগেওয়ার (ডক্তারজী)** ইত্যাদি পুস্তকের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করা হয়। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ভাষণের মাধ্যমে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন লোকপ্রজ্ঞার রাজ্য সম্পর্ক প্রমুখ ডাঃ আশিস মণ্ডল।

মহিলা আইনজীবীদের উদ্যোগে পদযাত্রা

ভারতীয় বীর সেনানীদের পরাক্রম ও অপারেশন সিঁদুরের সফলতার জন্য কলকাতা হাইকোর্টের মহিলা আইনজীবীদের উদ্যোগে গত ১৫ মে এক পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। এদিন বেলা ১টা ৩০ মিনিটে হাইকোর্টের বি গেট থেকে নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং পর্যন্ত পদযাত্রায় শতাধিক মহিলা আইনজীবী অংশগ্রহণ করেন। আইনজীবীরা অপারেশন সিঁদুরের সফলতায় ভারতীয় সেনার জয়গান করে হিন্দু নারীর সিঁদুর মুছে ফেলার জন্য জঙ্গিদের এবং তাদের মদতদাতা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের দাবি জানান।

বহরমপুরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে বুদ্ধপূর্ণিমা উদ্‌যাপন

গত ১১ মে বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে বহরমপুর বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কার্যালয়ে আয়োজন করা হয় 'ভগবান বুদ্ধ ও সমরসতা' বিষয়ক এক আলোচনা সভা। বক্তব্য রাখেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সামাজিক সমরসতা অভিযানের ক্ষেত্রীয় প্রমুখ গৌতম সরকার। উপস্থিত সকলে ভগবান বুদ্ধের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জেলা সামাজিক সমরসতা প্রমুখ সন্তোষ রজক। পূজা ও যজ্ঞ সমাপন্তে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সামাজিক সমরসতা অভিযানের উদ্যোগে বহরমপুর শহরে জলসত্র

গত ১৪ মে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সামাজিক সমরসতা অভিযানের উদ্যোগে বহরমপুর শহরে গঙ্গার ঘাটে সারাদিন ব্যাপী পথচলতি মানুষকে পানীয় জল দান করা হয়। প্রচণ্ড দাবদাহে মানুষকে ছোলা, গুড় ও শীতল জল দেওয়া হয়। জলসত্রে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রান্ত সহ সভাপতি সুনন্দা ঠাকুর, জেলা সভাপতি কৃষ্ণেন্দু সরকার, জেলা সমরসতা অভিযানের নগর সম্পাদক দেবাশিস দত্ত।

বঙ্গ নারীশক্তির উদ্যোগে 'অভিনন্দন যাত্রা'

গত ৭ মে অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে পাক সন্ত্রাসবাদ দমনে ভারতের বীর সেনানীদের সাফল্যলাভের পর তাঁদের অভিনন্দন জানানোর উদ্দেশ্যে গত ২০ মে জাতীয়তাবাদী সংগঠন 'বঙ্গ নারীশক্তি'র উদ্যোগে কলকাতায় একটি বর্ণাঢ্য পদযাত্রা আয়োজিত হয়। উত্তর কলকাতায় সিমলায় স্বামী বিবেকানন্দের বাড়ি থেকে শুরু হয়ে বাগবাজারে ভগিনী নিবেদিতার বাড়িতে শেষ হয় বঙ্গ নারীশক্তি আয়োজিত এই 'অভিনন্দন যাত্রা'। সমাজের বিভিন্ন স্তরের অসংখ্য মহিলা এই অভিনন্দন যাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। স্বামীজীর বাড়ির সামনে থেকে প্রায় ১০০ ফুট দীর্ঘ একটি তিরঙ্গা পতাকা নিয়ে এই পদযাত্রা শুরু হয়। পদযাত্রায় দেশভক্তিমূলক গান ও আবৃত্তির মাধ্যমে দেশের সম্মান রক্ষাকারী সেনাবাহিনীর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। পদযাত্রা থেকে স্লোগান ওঠে, 'অক্ষয় সিঁদুর হোক মায়ের সীমন্ত— সুদৃঢ়, সুরক্ষিত হোক দেশের সীমান্ত'। পদযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ভারতীয় সেনার প্রাক্তন মেডিক্যাল অফিসার মেজর ডাঃ অগ্নিদীপা দাস, বিধায়িকা অগ্নিমিত্রা পাল, পূর্বতন সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়-সহ নীলাঞ্জনা রায়, পাপিয়া মিত্র, শর্বরী মুখোপাধ্যায়, সোনালি ভট্টাচার্য, জয়ন্তী মণ্ডল সরকার, নন্দিনী রায়, মহাশ্বেতা চক্রবর্তী, বিশিষ্ট আইনজীবী সুস্মিতা সেন প্রমুখ। ভগিনী নিবেদিতার বাড়ির সামনে 'অভিনন্দন যাত্রা' শেষের পর এই স্থানে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর কৃতিত্বের বিষয়টি তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তুলে ধরেন মেজর অগ্নিদীপা দাস। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে কর্নেল সোফিয়া কুরেশি ও উইং কমান্ডার ব্যোমিকা সিংহের কথা। উপস্থিত সকলে দেশের সার্বভৌমত্ব ও হিন্দুসমাজের সার্বিক সুরক্ষার সংকল্পগ্রহণ করেন।

হিন্দু সাম্রাজ্য দিনোৎসব—বর্তমান প্রেক্ষাপট

ডাঃ শিবাজী ভট্টাচার্য

ভারতবর্ষের গৌরবোজ্জ্বল সুপ্রাচীন ইতিহাসের ধারা হঠাৎ যেন থমকে গেল, সনাতন ধর্ম আধারিত ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতা অকস্মাৎ যেন পথ হারাল ঘনকালো কুয়াশার আবর্তে। ৬৬৪ খ্রিস্টাব্দ। বর্বর, রক্ত পিপাসু, লুণ্ঠনকারী মুসলমান আরবেরা কাবুলে পৌঁছায়। আরব সেনাপতি সুহল্লার ভারতবর্ষে হামলা চালিয়ে মুলতান পর্যন্ত অগ্রসর হয়। সেই শুরু। ভারতের ভাগ্যাকাশে ঘনিয়ে উঠল কালো মেঘের ঘনঘটা। যদিও প্রায় আশি বছরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর হিন্দু বীরেরা সিন্ধুদেশ পর্যন্ত ধাবমান আরব দস্যুদের প্রতিহত করে হটিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু দশম শতকের শেষ অবধি আগ্রাসী মুসলমান আক্রমণকারীদের সঙ্গে হিন্দু রাজাদের ঘোর সংঘর্ষ লেগে যেত মাঝে মাঝেই। তারপর ১০০১ থেকে ১০২৪ সাল পর্যন্ত গজনির সুলতান মামুদ একাই ভারতবর্ষ আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেছে মোট ১২ বার। কত মঠ, মন্দির, জনপদ যে ধ্বংস হয়েছে তা শুনলে শিউরে উঠতে হয়। গুজরাটের বিশাল সোমনাথ মন্দিরও ধ্বংস হয় মামুদের বারবার আক্রমণে।

তারপর সময় যত এগিয়েছে ভারতবর্ষের তথা হিন্দুদের পরাধীনতার শৃঙ্খল তত ভারী হয়েছে। একে একে গজনভি বংশ (৯৯৯-১১৫২), ঘুরবংশ (১১৫২-১২০৬), দিল্লির দাস রাজারা (১২০৬-১২৮৮), খিলজি বংশ (১২৮৮-১৩২১), তুঘলক বংশ (১৩২১-১৪১৪), সৈয়দ শাসন (১৪১৪-১৪৫০), লোদি বংশ (১৪৫০-১৫২৬) বিভিন্নভাবে হিন্দুদের পদানত করে ভারতবর্ষের নানা অংশ শাসন করেছে, করেছে শোষণ। মুসলমান শাসকদের অত্যাচার আর লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে হিন্দু রাজারা স্থানে স্থানে প্রতিরোধ গড়ে তুললেও সামগ্রিক ভাবে সুসংহত ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ না থাকায় মধ্যযুগীয় বর্বর শাসন ভারতবর্ষের উপর উত্তরোত্তর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসল। হিন্দু চেতনা তথা রাষ্ট্রভাবনা ও দেশাত্মবোধ উত্তরোত্তর ক্ষয়িষ্ণু হয়েই চলল। এল মুঘল শাসন। তৈমুরলঙের বংশধর বাবর পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ (১৫২৬) ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করে দিল্লি ও আগ্রা দখল করে। শুরু হলো হিন্দুদের সর্বনাশের আর এক অধ্যায়।

পরপর মুঘল শাসকদের অত্যাচারে হিন্দু সংস্কৃতি, দেশীয় শ্রদ্ধাস্থলগুলি ক্রমশ

কোণঠাসা ও ভূলুণ্ঠিত হতেই থাকল। ছলে-বলে- কৌশলে হিন্দু রাজত্ব লুণ্ঠন ও আত্মসাৎ, হিন্দু নারীর অসম্মান, হিন্দু ধর্মাচরণে বাধা এবং হিন্দুদের ইসালামে ধমান্তরিত করা— এই ছিল মুঘল শাসকদের প্রাথমিক লক্ষ্য। কোরান ও তরবারির মাঝখানে পড়ে স্বধর্ম রক্ষায় কত হিন্দু বীর যে প্রাণ দিয়েছেন, মুসলমান শাসকদের লোলুপ দৃষ্টিতে ও স্পর্শ থেকে বাঁচতে যে কত হিন্দু রমণী জহরব্রত পালনে আত্মাহুতি দিয়েছেন, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। যখন আত্মবিস্মৃত বহু হিন্দু বীর নিজ দেশ ও ধর্মের প্রতি দায়িত্ব পালনে পরান্মুখ হয়ে মুসলমান মুঘল শাসকদের বেতনভুক সেনাপতি বা আমির ওমরাহ হয়ে 'দিল্লিশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' মেনে নিয়েছেন, তখন ভারতবর্ষের পশ্চিমতট মহারাষ্ট্র প্রদেশে এক বীর মহাপুরুষের জন্ম হয়। (১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৬৩০)।

হাজার বছরের পরাধীনতা ও আত্মবিস্মৃতির অতল গহ্বর থেকে হিন্দুজাতি তথা ভারতবর্ষকে আবার স্বাধীনতার আলো দেখাতে ও আত্মশক্তির পুনঃস্থাপনে উজ্জীবিত করতে যে বীর আবির্ভূত হলেন— তিনি হিন্দুকুলগৌরব ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ। হাজার বছর ধরে ক্রমাগত মুসলমান শাসকদের নানাবিধ অত্যাচার ও যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে যে দেশ খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত, সেই রাজনৈতিক অবক্ষয়ী প্রেক্ষাপটে শিবাজীর ভাবনা— 'এক ধর্মরাজ্য পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি' সারা দেশে তথা হিন্দু মানসে এক নবচেতনা সঞ্চারিত করেছিল। শিবাজীর প্রখর বুদ্ধি, বিপুল পরাক্রম ও দুর্মর প্রতিজ্ঞা 'এক ধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে' সমগ্র সুপ্ত হিন্দু জাতিকে উদ্বেলিত করেছিল, অণুপ্রাণিত করেছিল স্বাজাত্যভিমানে।

পুনার প্রত্যন্ত পার্বত্যপ্রদেশের মাওয়ালিদের সমর কৌশল শিক্ষা দিয়ে তাদের উন্নত যোদ্ধায় পরিণত করেন শিবাজী মহারাজ এবং ছোটো ছোটো সেনাদল তৈরি করে বিপক্ষের বড়ো সেনাদলকে অতর্কিতে আক্রমণ করার কৌশলে বিজাপুরের সুলতান কিংবা মুঘল বাদশার সৈন্যদলকে বারবার পর্য্যুদস্ত করেন তিনি। অসংখ্য গেরিলা যুদ্ধে সফলতার ফসল হিসেবে বহু গুরুত্বপূর্ণ দুর্গম ও অজেয় গিরিদুর্গ শিবাজী দখল করেন এবং ক্রমে দক্ষিণভারতে একটি স্বাধীন হিন্দু সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। রায়গড় দুর্গে তাঁর রাজ্যাভিষেকর দিনটি (জ্যৈষ্ঠ শুক্ল ত্রয়োদশী, ৬ জুন, ১৬৭৪) হিন্দু সমাজের কাছে একটি শুভদিন। কারণ তা পরাধীন মুঘল ভারতবর্ষে হিন্দু জনমানসে স্বাধীনতার স্বাদ এনে দিয়েছিল, মুসলমান শাসনের নাগপাশ থেকে ভারতবর্ষের আপামর হিন্দুর মুক্তির দিন ঘোষিত হয়েছিল, ফিরে এসেছিল স্বাভিমান— তাই সেই দিনটি ভারতবর্ষের ইতিহাসে 'হিন্দু সাম্রাজ্য দিনোৎসব' নামে পরিচিত। বুদ্ধির ও শক্তির খেলায় হিন্দুপাদ-পাদশাহী ছত্রপতি শিবাজীর কাছে আওরঙ্গজেব এমনভাবে বারবার পর্যুদস্ত হয়েছেন যে কার্ল মার্কস রসিকতা করে ওই মুঘল বাদশাহের ব্যবহারকে 'গাধা'র সঙ্গে তুলনা করেছেন।

ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের জীবন ও কর্মপদ্ধতি, তাঁর ব্যক্তি নির্মাণের আদর্শ তাঁকে কুশলী রাষ্ট্রনেতার মর্যাদা দিয়েছে। তাই তাঁর রাজ্যাভিষেকের দিনটিকে জাতীয়তাবোধের উদ্বোধনের দিন হিসেবে, বিদেশি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের জনগণের মধ্যে দেশপ্রেম ও আত্মশক্তির পুনরুত্থানের দিন হিসাবে পালন করার জন্য লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক সমগ্র দেশবাসীকে আহ্বান জানালেন— পালিত হলো 'শিবাজী উৎসব'। পূর্ব ভারতে এই উৎসবের প্রবর্তন করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তিনি আহ্বান জানালেন— 'মারাঠির সাথে আজি, হে বাঙ্গালি, এক কণ্ঠে বলো 'জয়তু শিবাজী'। মারাঠির সাথে আজি, হে বাঙ্গালি, এক সঙ্গে চলো মহোৎসবে সাজি।'

ব্রিটিশ শাসন অবসানকল্পে বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী শিবাজী মহারাজের জীবন ও কর্ম থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বলেছেন, 'ভারতীয়দের সামনে স্বাধীনতাযুদ্ধে সফলতা লাভের জন্য শিবাজীর উদাহরণ রাখা উচিত।' 'অভিনব ভারত' দলের সদস্যরা শিবাজী মহারাজের চিত্রের সামনে শপথ নিতেন। আচার্য যদুনাথ সরকারের মতে, 'তিনিই (শিবাজী) আধুনিক আত্মসচেতন হিন্দু জাতির পূর্ণ অভিব্যক্তি লাভের দীক্ষাদাতা'। তিনি আরও পরিষ্কার করে বলেছেন, 'শিবাজীর চরিত-কথা আলোচনা করিয়া আমরা এই শিক্ষা পাই যে, প্রয়াগের অক্ষয়বটের মতো হিন্দুজাতির প্রাণ মৃত্যুহীন। কত শত বৎসরের বাধা-বিপত্তির ভার ঠেলিয়া আবার মাথা তুলিবার, আবার নূতন শাখাপল্লব বিস্তার করিবার শক্তি তাহাদের মধ্যে নিহিত আছে। ধর্মরাজ্য স্থাপন করিলে, চরিত্রবলে বলীয়ান হইলে, নীতি ও নিয়মানুবর্তিতাকে অন্তরের সহিত মানিয়া লইলে, স্বার্থ অপেক্ষা জন্মভূমিকে বড়ো ভাবিলে, বাগাড়ম্বর অপেক্ষা নীরব কার্যকে সাধনার লক্ষ্য করিলে— জাতি অমর অজেয় হয়।'

ছত্রপতি শিবাজী চলে গেছেন সেই কবে (৬ এপ্রিল, ১৬৮০), কিন্তু তাঁর মাত্র পঞ্চাশ বছরের জীবনে সমগ্র ভারতবর্ষের হিন্দুজাতিকে হাজার বছরের পরাধীনতার গ্লানি থেকে উদ্ধারের পথ দেখিয়েছেন, জাগিয়ে তুলেছেন জাতির বিজিগীষুভাব ও সৌভ্রাতৃত্ববোধ। তাই এত বছর পরেও ক্রমাগত নানাবিধ আক্রমণে যখন আমাদের দেশ, জাতি, সংস্কৃতি নানাভাবে আক্রান্ত হচ্ছে বিধ্বস্ত হচ্ছে প্রতিনিয়ত আমাদের স্বধর্মলালিত মূল্যবোধ, তখন শিবাজী মহারাজের আদর্শ সমান প্রাসঙ্গিক, সমান অর্থবহ। তাই হিন্দু সাম্রাজ্য দিনোৎসব পালনে আমরা ছত্রপতি শিবাজী মহারাজকে স্মরণ করে প্রার্থনার ভাষাতেই জানাই— 'হে বীর, আমরা, হিন্দুরাষ্ট্রের সন্তানরা তোমাকে প্রণাম করি। তোমারই কাজে কোমর বেঁধেছি। আশীর্বাদ কর। আমাদের সেই শক্তি দাও, যাতে পৃথিবীর কেউ আমাদের আর পরাজিত করতে না পারে। আমাদের শুদ্ধ চরিত্রবলে বলীয়ান কর। সেই চরিত্র দাও যা সারা বিশ্বে মান্য হবে। সেই জ্ঞান দাও যাতে স্বেচ্ছায় যে কণ্টকময় পথে চলেছি তা সুগম হয়ে উঠবে।' □

দু’ হাজার বছরের প্রাচীন হাওড়া শিবপুরের বেতাই চণ্ডী মন্দির

অদিতি চক্রবর্তী

পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীনতম দেবালয় ও প্রসিদ্ধ উপপীঠগুলির মধ্যে শ্রীশ্রী বেতাই চণ্ডীর মন্দির অন্যতম। সুদীর্ঘ অতীতের নানাবিধ বিবরণ ও ইতিবৃত্তে এই দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়।

দেবী বেতাই চণ্ডী মূলত লৌকিক দেবী, কিন্তু কালক্রমে শাস্ত্রীয় দেবী ‘বেত্রচণ্ডিকা’ নামে পরিচিতা ও পূজিতা। এই দেবী মূর্তির বৈশিষ্ট্য হলো— প্রকৃতির খেয়ালে মানুষের মুখের আদলে সৃষ্ট একটি প্রস্তর খণ্ড। প্রায় হাজার বা তারও বেশি বছর ধরে এই মুখাবয়ব বিশিষ্ট প্রস্তর খণ্ডে সিঁদুর লেপনের ফলে দেবী বেতাই চণ্ডীর বর্তমান রূপটা প্রকাশ পেয়েছে ভক্তজনের কাছে।

দেবীর আসল রূপটি আজ অজানা। তবে দেবীর সেবাইতরা বংশানুক্রমে শুনে এসেছেন, দেবীর মূর্তিটি একটি মুখের আদলে সৃষ্ট এক প্রস্তর খণ্ড। দেবী দুর্গা ও চণ্ডী রূপে পূজা ও আরাধনা করা হয়। প্রতিদিন সকালে দেবীকে স্নান করিয়ে নতুন বস্ত্র পরিধান করানো হয় এবং ভক্তি সহকারে আড়ম্বরে নিত্য পূজা সমাপন হয়। দুপুরে দেবীর ভোগ হয় এবং ভোগে প্রতিদিন মাকে মাছ রান্না করে দিতে হয়। শীতকালে মাকে অবশ্যই শীতবস্ত্র পরিধান করানো হয়।

দেবী বেতাইচণ্ডী (বেত্রচণ্ডিকা)-র অধিষ্ঠান গঙ্গার পবিত্র পশ্চিম তীরে হাওড়া শহরের দক্ষিণ প্রান্তে শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের কাছে বেতাইতলায় জিটি রোডের ওপর।

বহুকাল আগে, প্রায় ১২০০ থেকে ১৫০০ বছর আগে হাওড়ার দক্ষিণ অঞ্চলের বিস্তীর্ণ ভূমি নীচু জলাভূমি ছিল। নীচু জলাভূমি অর্থাৎ হাওড় থেকে হাওড়া নামকরণ। এই নীচু জলাভূমি গভীর বেতবনে আবৃত ছিল। এই বেতবনেই বঙ্গের পাল রাজবংশের আমলে প্রচলিত দেবী বেতাইচণ্ডীর আরাধনা হতো, বেতবনে দেবী আরাধিতা বলেই দেবীর নাম বেতাইচণ্ডী বা বেত্রচণ্ডিকা। এই তথ্য জানা যায় শিবপুর কাহিনি তথা লেখক অন্নদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বিবরণ থেকে।

প্রাচীন যুগের দ্বিতীয় ভাগ হলো সেন বংশের আমল। ২৪ পরগনা জেলার গোবিন্দপুরে প্রাপ্ত রাজা লক্ষ্মণ সেনের তাম্রশাসনে উল্লেখ আছে, ‘বেতড্ড-চতুরক নামক স্থানের অন্তর্গত একখানি গ্রাম জনৈক ব্যাসদেব শর্মা নামক ব্রাহ্মণকে তিনি দেবসেবার নিমিত্ত দান করেন। এই বেতড্ড-চতুরক বর্তমান হাওড়া জেলার ‘বেতড়’ নামক স্থানটি। বহু পণ্ডিত এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। মুঘল আমলের আগেই এই অঞ্চলে প্রসিদ্ধ জনপদ ছিল এবং বেতড়ের মধ্যে দিয়ে সরস্বতী নদী প্রবাহিত ছিল। সেই সরস্বতী নদী আজ বিলুপ্ত প্রায়। মুঘল আমলেও এই নদীপথে ব্যবসা বাণিজ্য চলত। বেতাইতলা, শিবপুর

ও বোটানিক্যাল গার্ডেন সংলগ্ন বহু জনপদ আগে বেতোড়ের অধীন ছিল। ডি. ব্যারোজ (১৫৫২-১৬১৩), ব্লায়েভ (১৬৪৫-৫০) এবং রেনেলের (১৭৭৯-৮১) মানচিত্রে বেতোড়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই বেতড় বা বেতোড়ের একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী ছিলেন শ্রীশ্রী বেতাইচণ্ডী মাতা।

একটা বিষয় প্রমাণিত যে, সেন বংশের আগেই পাল রাজবংশের আমলে বেতাইচণ্ডীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এই বেতোড়ের বেতবনেই তিনি পূজিতা, সুতরাং রাজা লক্ষ্মণ সেন দেবসেবার জন্য দান করেছেন, এমন অনুমান করে নেওয়াটা বোধহয় অবিশ্বাস্য মনে হয় না। শিবপুরের এক প্রাচীন দুর্গাপূজার স্মরণিকা ক্রোড়পত্রে জনৈক লেখক উল্লেখ করেছেন, বেতাইচণ্ডীর মন্দির ২০০০ বছরের প্রাচীন। প্রসঙ্গত বলা যায়, সেন রাজবংশের আমলে বেতোড়ে বেতাইচণ্ডী ভিন্ন অন্য কোনো দেবস্থানের নাম পাওয়া যায় না।

১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দে বিপ্রদাস পিপলাই রচিত মনসামঙ্গলে এবং ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দে কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম রচিত চণ্ডীমঙ্গলে বেত্রচণ্ডিকা বা বেতাইচণ্ডীর উল্লেখ পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে বেতোড় ও সন্নিহিত অঞ্চলের বিবরণও পাওয়া যায়। শ্রীমন্ত সদাগরের গঙ্গাসাগর যাওয়ার কালে।

‘চিৎপুর শালিখা সে এড়াইয়া যায়।
কলিকাতা এড়াইল বেনিয়ার বালা।
বেতোড়েতে উপজিল অবসান বেলা।
সমস্ত গ্রাম খানা সাধু এড়াইল গ্রামে।’

কবি কঙ্কণের সম সাময়িক কবি মাধবাচার্যের চণ্ডী মঙ্গলেও :

‘ছৈঘরে বসিয়া সাধু বলে বাহবা
বেতোড়েতে উপজিল সাধুর সপ্তলা।’

মনসা মঙ্গলে সর্বদেব দেবী বন্দনা দেখা যায়—

‘বন্দনা করিতে ভাই না করিব হেলা
বালি ডাঙায় বন্দিলাম সর্বমঙ্গলা।
কালীঘাটে কালীবন্দ, বেতোড়ে বেতাই।
পুরটে ঠাকুর বন্দো, আমতার মেলাই।’

কালক্রমে সরস্বতী নদী মজে যাওয়ায় বেতোড়ে ব্যবসা বাণিজ্যের ঘাটতি এবং ইংরেজ বণিকদের কলিকাতায় রাজধানী স্থাপন ও বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে ওঠায় বেতোড়ের ব্যবসা বাণিজ্য ও সমৃদ্ধি কমে আসে এবং তার মর্যাদা ও হ্রাস পায়। তবে বেতোড়ের মর্যাদা কমে এলেও, উপপীঠ বেতাইচণ্ডীর মাহাত্ম্য বিলীন হয়নি বা একটু ও হ্রাস পায়নি।

বেতোড় বাণিজ্য কেন্দ্র হওয়ায় মাঝে মাঝে মগ আরাকান দস্যু (জলদস্যু)-রা বেতোড়ে উৎপাত শুরু করে। ইতিমধ্যে বীরভুঁইয়ার অন্যতম প্রতাপাদিত্য রায় তাঁর সৈন্য বাহিনীর নায়ক নির্বাচিত করেন, পর্তুগিজ রডাকে। তাঁদের যৌথ উদ্যোগে সুন্দরবন থেকে বেতোড় পর্যন্ত নদী পথের পাশে পাঁচটি দুর্গ নির্মিত হয়। এই দুর্গগুলির মধ্যে অন্যতম হলো বেতাই মন্দিরের অদূরে থানা মাকুয়ায়। এর পরবর্তীকালে থানা মাকুয়া মুঘলদের অধিকারে আসে।

সেবাইত বংশ ও তাঁদের পারিবারিক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।।

বেতাইচণ্ডীর সেবাইত শুদ্ধ শ্রোত্রীয় বাৎস্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ (কুলপদবি ঘোষাল)। এই বংশ সুদীর্ঘকাল ধরে দেবী চণ্ডিকার সেবা পূজা করে আসছেন। কমপক্ষে ঊর্ধ্বতন ৯/১০ পুরুষের নাম পাওয়া যায়। এই সেবাইত বংশ বরাবরই শিবপুরে বসবাস করছেন। শেওড়াফুলি রাজার প্রদত্ত নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমিতে তাঁরা বসবাস করছেন। এক সময় তাঁরা বিপুল জমিজমার স্বত্বাধিকারী থাকলেও কালক্রমে বিভিন্ন কারণে বেশিরভাগ ভূসম্পত্তি হস্তান্তরিত হয়।

এই সেবাইত বংশ ‘হাবিলদার’ উপাধিতে ভূষিত হয় নবাবি আমলে। হাবিলদার থেকে ক্রমে হালদার বংশ নামে তাঁরা পরিচিত। প্রসঙ্গত বলা যায়, আলিবর্দি বা তাঁর আগে কোনো এক নবাব এই হাবিলদার উপাধি দেন। নবাব মফস্‌সল সফরে দক্ষিণবঙ্গে এলে তাঁর নিজস্ব প্রাসাদে থাকতেন। নবাবের প্রাসাদ যখন ফাঁকা থাকতো, তখন সেই প্রাসাদে দেওয়ানি ও ফৌজদারি দুই বিচার ব্যবস্থা সম্পন্ন হতো। আজ সেই স্থানের কাছেই বোটানিক্যাল গার্ডেনের সুবিশাল বটবৃক্ষ। এই কথা আগেই বলা হয়েছে, দেওয়ানি বিচারক ছিলেন হাবিলদার বা হালদাররা (বেতাই চণ্ডীর সেবাইত বংশ) এবং ফৌজদারি মামলার বিচারক ছিলেন কাজীরা (কাজীপাড়া)।

বিভিন্ন নথি, তথ্যসূত্র বা বিবৃতি থেকে জানা যায়, দেবী বেত্রচণ্ডিকা বা বেতাইচণ্ডীর সুদীর্ঘকাল সেবাইতদের গৃহে অধিষ্ঠিতা এবং সেখানেই নিত্য পূজিতা। অনেকেরই মনে প্রশ্ন ওঠে, দেবীর আবির্ভাব ও আদি পূজাস্থান বেতোড়ের বেতভবনে, তাহলে দেবী সেবাইত হালদার বংশের গৃহে অধিষ্ঠিতা ছিলেন কেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে ৩টি সম্ভাব্য কারণ মনে আসে : ১. বেতোড় বন্দরের মর্যাদাহানি, লোক সমাগম কম, তাই দেবী মন্দিরে ভক্ত সমাগমও কম, ২. ‘থানা’ মাকুয়াকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেবী বিগ্রহের ক্ষতি সাধন ও পূজায় বিঘ্ন হওয়ার আশঙ্কা। ৩. বেতোড়ের অন্তর্গত শিবপুরের শ্রীবৃদ্ধি এবং ক্রমশ ভক্ত সংখ্যা বৃদ্ধি। মনে হয়, ওই ৩টি কারণের কোনো একটির কারণে নয়তো সম্মিলিতভাবে ৩টি কারণেই দেবী বেত্রচণ্ডিকাকে নিরাপদস্থানে সেবাইতগৃহে সেবাইতরা স্থানান্তরিত করেন। তাঁরা এই স্থানান্তরণ যুক্তিযুক্ত মনে করেছিলেন।

মূল মন্দিরের উত্তর দিকের ফাঁকা জমিতে একটি ফুল বাগান ছিল। সেখানে এখন একটি হনুমানজীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেই সঙ্গে মন্দির সংলগ্ন বাকি অংশে বিবাহ, উপনয়ন-সহ অন্যান্য অনুষ্ঠান এবং হোম, যাগযজ্ঞাদি করার জন্য সুন্দরভাবে, সুপরিকল্পিত ব্যবস্থায় নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হয়েছে। প্রয়োজনে দূরদূরান্তের পূজার্থীরা এইখানে বিশ্রাম ও নিতে পারেন।

তথ্যসূত্র :

শ্রীঅরবিন্দ হালদারের লেখা বই ‘পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রাচীন উপপীঠের দেবী শ্রীশ্রী বেতাইচণ্ডী মাতা।’ (দেবীর অন্যতম সেবাইত)। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৫-১৫।

জলসংকট বিশ্ববাসীর কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যদি কখনো বাধে, তা জমি বা দেশ দখল নিয়ে নয়, জলসম্পদের অধিকার নিয়ে বাধবে। তাই, কোমর বেঁধে জল অপচয় রোধ করতে নেমে পড়া ছাড়া দ্বিতীয় উপায় নেই।

হীরক কর

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রামে পানীয় জলের সমস্যা অনেকদিন ধরে দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তথ্য বলছে, ১৯৪৭ সাল থেকে মাথাপিছু একজন মানুষের যত পরিমাণ জল লাগে, তার পরিমাণ প্রায় ৭৫ শতাংশ কমে গেছে। অর্থাৎ সহজ কথায় বলতে গেলে মানুষের ব্যবহার্য জলের পরিমাণ ক্রমেই কমছে। অনেকেই জানেন এই পৃথিবীর মোট জলের ৯৭ শতাংশ লবণাক্ত এবং পানের অযোগ্য। আর ২ শতাংশ তুষার হয়ে জমাট বাঁধা অবস্থায় রয়েছে। মাত্র ১ শতাংশ জল সারা পৃথিবীর মানুষ নানাভাবে ব্যবহার করে। তাই এক ভয়াবহ দিন আসছে সামনে। সেন্ট্রাল গ্রাউন্ড ওয়াটার বোর্ড-এর রিপোর্ট বলছে, ১৯৮৬ সালে কলকাতা পুরসভার অন্তর্ভুক্ত এলাকায় গভীর নলকূপের সংখ্যা ছিল ২৩২টি এবং হাতপাম্প-যুক্ত অগভীর নলকূপ ছিল ৫ হাজার। গভীর আর পাম্প-যুক্ত অগভীর নলকূপ—দু' ধরনের নলকূপের মাধ্যমে মাটির নীচ থেকে তোলা জলের পরিমাণ তখন ছিল দৈনিক ১২১.৫ মিলিয়ন লিটার। ২০০৬ সালে সেই সংখ্যা কমলেও শহর থেকে এখনো পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়নি নলকূপ।

২০২৪ সালের মধ্যে গ্রামের সমস্ত বাড়ি বাড়ি নলবাহিত বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার 'জল জীবন মিশন প্রকল্প'-এর সূচনা করেছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের 'জল জীবন মিশন প্রকল্প'-সব থেকে পিছিয়ে পশ্চিমবঙ্গ। কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রকের এক রিপোর্টে এমন তথ্যই উঠে এসেছে। এই প্রকল্পকে বাস্তবায়িত করতে পশ্চিমবঙ্গকে চাহিদা মতোই অর্থ জোগানো হচ্ছে। কিন্তু কাজের গতির নিরিখে পশ্চিমবঙ্গে অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অথচ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দাবি, আগামী বছর মার্চের মধ্যেই রাজ্যের গ্রামের প্রতিটি বাড়ি পৌঁছে যাবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৩ লক্ষ ৬০ হাজার কোটি টাকার এই প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল, 'হর ঘর জল'। কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, এই প্রকল্পের হাত ধরে সমগ্র দেশের ১২ কোটি ৯২ লক্ষ গ্রামীণ পরিবারে এই নলবাহিত বিশুদ্ধ পানীয় জলের পরিষেবা পৌঁছিয়ে গেছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই পরিসংখ্যান বেশ খারাপ। পশ্চিমবঙ্গের ১ কোটি ৭৩ লক্ষ গ্রামীণ পরিবারের মধ্যে মাত্র ৬৪ লক্ষ ৮৪ হাজার পরিবার এই পরিষেবা পেয়েছে। এই রাজ্যের ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়েছে মাত্র ৩৭ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী পুলক রায় এই প্রসঙ্গে বলেন, 'বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছানোর কাজ চলছে। অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে কাজ দেরিতে শুরু হয়েছে বলেই সময় একটু বেশি লাগছে'।

এই প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গের পিছিয়ে পড়ার কারণ হিসেবে রাজ্যের গাফিলতিকে দায়ী করছে কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রক। পশ্চিমবঙ্গের অর্ধেক বাড়িতে এখনো পৌঁছায়নি নলবাহিত পানীয় জল। এখানেই প্রশ্ন ঘোরাফেরা করছে, কবে পশ্চিমবঙ্গবাসী

ফ ঃ ৫

এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হিসেবে বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের সংযোগ পাবে? জল জীবন মিশন ড্যাশবোর্ডে এক নজরে দেখা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গ এখনো পর্যন্ত এই প্রকল্পের রাজ্যের মাত্র ৫৪ শতাংশ কভার করেছে। আর বাস্তবে যেখানে পাইপ লাইন বসানো হয়েছে, সেখানেও জল পর্যন্ত পড়ছে না। কোথাও আবার সেই পাইপ লাইন পর্যন্ত খুলে নেওয়া হয়েছে। যেমন, হুগলির বেরাবেড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাঙ্গোরডিহি গ্রামের বাসিন্দা বেদানা ধাড়া। তাঁর বয়স ৬৪ বছর। তাঁর বাড়ির কাছে একটি আবর্জনার স্তূপ থেকে একটি জং ধরা পাইপ উদ্ধার করা হয়েছে। তিন বছর আগে জাতীয় 'জল জীবন মিশন'-এর অধীনে ভারতজুড়ে পরিবারগুলোতে নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য এই পাইপ বসানো হয়েছিল।

সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট -এর তরফে প্রকাশিত 'স্টেট অব ইন্ডিয়াজ এনভায়রনমেন্ট ২০১৯' রিপোর্টে জলের অভাবের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়। ওই রিপোর্টে ২০১৮ সালে প্রকাশিত 'ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ডলাইফ ফান্ড'-এর (ডব্লুডব্লুএফ) একটি রিপোর্ট উদ্ধৃত করে যা বলা হয়েছে, তা রীতিমতো আশঙ্কার। ভারতের যে ক'টি শহরে পানীয় জল নিয়ে ভবিষ্যতে সমস্যা তৈরি হতে পারে, তার মধ্যে অন্যতম হলো কলকাতা।

এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, এখনই যদি জলের অপচয় বন্ধ না করা হয়, তাহলে আগামীদিনে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। জলের অপচয় রোধ করার জন্য প্রতি বছর ২২ মার্চ বিশ্ব জল দিবস পালিত হয়। জলের অপচয় রোধ এবং মানুষকে এর গুরুত্ব বোঝানোর জন্য এই দিবসটি পালিত হয়। কিন্তু শুধু উৎসব অনুষ্ঠান করলেই হবে না, সচেতনতা খুব প্রয়োজন।

২০১৯ সালের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২৪ সালের মধ্যে প্রতিটি গ্রামীণ পরিবারে নলবাহিত জল পৌঁছে দেওয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন। তারপর থেকে দেশে এই ব্যাপারে অগ্রগতির হার যথেষ্ট। ভারতের ১৯ কোটি ৪০ লক্ষ গ্রামীণ পরিবারের মধ্যে ১১৪ মিলিয়নেরও বেশি অর্থাৎ ৫৯ শতাংশ পরিবারে ইতিমধ্যেই নলবাহিত জলের কল স্থাপন করে দেওয়া হয়েছে। তবে একটি বড়ো প্রশ্ন থেকেই যায়, সব বাড়িতে যতটা পরিমাণ জলের প্রয়োজন, সেই জল আদৌ পৌঁছচ্ছে কি? বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, আগামী ৪০ বছরের মধ্যে ভারতে পানীয় জলের ভয়াবহ অভাব লক্ষ্য করা যাবে।

ভারতে নদী ও জলাশয়গুলোর অবস্থা খুব শোচনীয়। ভারতে ভূগর্ভস্থ জলের মোট পরিমাণের ৮৭ শতাংশ সেচের কাজে ব্যবহৃত হয়। আর এত বেশি পরমাণে জলের উত্তোলনই ভূগর্ভস্থ জল হ্রাসের অন্যতম কারণ। প্রচুর পরিমাণে ভূগর্ভস্থ জল তুলে নেওয়ার ফলে সঞ্চিত জলের পরিমাণ যে হারে কমছে, তা সম-পরিমাণে পূরণ হচ্ছে না। কারণ মাটির উপরের জল নানাভাবে অপচয় হচ্ছে। যেসব জলাশয়, হ্রদ বা প্রস্রবণ থেকে ভূগর্ভে জল যায়, সেগুলোও ক্রমশ শুকিয়ে যাচ্ছে। ভারতে সেচের কাজ ৬২ শতাংশ ভূগর্ভস্থ জলের ওপর নির্ভরশীল। আর তার পরিবর্তে ৮৭ শতাংশ উত্তোলন করা হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রচুর জল অপচয় হচ্ছে। এছাড়াও গ্রামীণ এলাকায় ৮৫ শতাংশ জল সরবরাহ করা হয়। শহর এলাকায় সরবরাহ করা হয় ৫০ শতাংশ জল। আর ভুগর্ভস্থ জল ভাবনাচিন্তা না করেই খরচ করা হচ্ছে। আর এর প্রভাব হতে পারে ভয়াবহ। এবং সেই দিন আসতে আর বেশি দিন বাকি নেই। কৃষিকাজে যেখানে জলের অত্যধিক প্রয়োজন পড়ে না, যেমন আখ চাষ কিংবা কলা চাষ, সেই সব স্থানে জল ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ আনা প্রয়োজন।

বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, বৃষ্টির ধরন বদলানোর ফলে এমনিতেই ভুগর্ভস্থ জলে টান পড়ছে। সেই অবস্থায় জলের এই ধরনের অপচয় ভবিষ্যতে জলসংকট ডেকে আনতে পারে। যার মাশুল গুনতে হতে পারে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে। এমনকী যেখানে গোটা দেশের মানুষ ভুগর্ভস্থ জলের উপরই নির্ভরশীল, সেখানে এই জলকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করা উচিত।

'জল জীবন মিশন-এর অধীনে যদি ভারতের সব বাড়িতে নলবাহিত জলের কল স্থাপন করা যায়, তবেই একমাত্র ভূগর্ভস্থ জলের দূষণ কমানো সম্ভব হবে।

প্রতিটি গ্রামীণ পরিবারে নলবাহিত পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দিতে ২০১৯ সালে এই প্রকল্প শুরু হয়। এ রাজ্যে তা শুরু হয়েছিল ২০২০ সালের মাঝামাঝি। ২০২১ সাল থেকে প্রকল্পের কাজ গতি পায় রাজ্যে। নিয়ম অনুযায়ী, জল জীবন মিশন প্রকল্পে মোট খরচের ৬০ ভাগ দেওয়ার কথা কেন্দ্রের এবং বাকি ৪০ ভাগ অর্থ রাজ্যের দায়িত্বে। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের হাতে থাকা এই প্রকল্পে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে কেন্দ্রীয় শেয়ারের বাজেটে ধরা ৫,০৪৯.৯৮ কোটি টাকার মধ্যে বরাদ্দ হয়েছে মাত্র ২,৫২৪.৯৯ কোটি টাকা। রাজ্য সরকার তার শেয়ারের বাজেট হিসেবে ধরেছিল ৪,৯৯০.৫২ কোটি টাকা। যার মধ্যে এখনো পর্যন্ত বরাদ্দ করেছে ৩,৭৫৭.৪৫ কোটি টাকা। অনেক রাজ্য কেন্দ্রীয় অর্থ না মেলার জেরে প্রকল্পের কাজ বাধা পাচ্ছে। দপ্তর সূত্রে খবর, এমন অবস্থায় রাজ্য কেন্দ্রীয় শেয়ারের বাইরে অতিরিক্ত ১,২৯১.৩৮ কোটি টাকা এখনো পর্যন্ত বরাদ্দ করেছে।

দেশের রাজধানী দিল্লিতে প্রতি বছর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে জলসঙ্কটের সমস্যাও। বিশেষত গ্রীষ্মকালে এই সঙ্কট আরও বেড়ে যায়। দিল্লি যমুনা নদীর উপর নির্ভরশীল। কিন্তু নদীটি খুবই খারাপ অবস্থায় চলে গিয়েছিল। দিল্লি ওয়াটার বোর্ডের মতে, দেশের রাজধানী মোট জলের চাহিদার ৯০ শতাংশেরও বেশি জলের জন্য প্রতিবেশী রাজ্যগুলির ওপর নির্ভরশীল। ভূগর্ভস্থ জল ছাড়াও গঙ্গা, যমুনা ও সিন্ধু অববাহিকা থেকে জল পাওয়া যায়। বর্তমানে রাজধানীর ৯৩ শতাংশ বাড়িতে পাইপলাইনের মাধ্যমে জল যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, অন্যান্য শহরের মানুষ দিল্লিতে আসায় এখানে দ্রুত জলের চাহিদা বাড়ছে। আগামীদিনে দিল্লিবাসী ব্যাপক জলসঙ্কটের সম্মুখীন হবে।

রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রকাশিত তথ্য বলছে, ২০১৬ সালে পৃথিবীর ৯.৩৩ কোটি মানুষ জলসংকটের সম্মুখীন হয়েছে। এরপর অনেক দেশেই এই জলসংকট দ্রুত বেড়ে যায়। এশিয়ার প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষ জলসংকটের সম্মুখীন। এই সমস্যা উত্তর-পূর্ব চীন, ভারত ও পাকিস্তানে সবচেয়ে বেশি। এসব দেশের বিভিন্ন জায়গায় মানুষের জন্য পানযোগ্য বিশুদ্ধ জলটুকুও নেই। শুধু যে এসব দেশ তাই হয়, পশ্চিম এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক দেশেই পানীয় জলের সমস্যা ভয়াবহ।

রাষ্ট্রপুঞ্জের রিপোর্ট অনুযায়ী, বিশ্বের ২৬ শতাংশ মানুষের কাছে বিশুদ্ধ পানীয় জল নেই। তবু জলের অপচয় কমছে না বিন্দুমাত্রও।

দেশে সর্বমোট ২৪ লক্ষ ২৪ হাজার ৫৪০টি জলাশয় রয়েছে। এর মধ্যে ৯৭.১ শতাংশ অর্থাৎ, ২৩ লক্ষ ৫৫ হাজার ৫৫টি জলাশয় রয়েছে গ্রামীণ এলাকায় এবং কেবলমাত্র ২.৯ শতাংশ অর্থাৎ ৬৯ হাজার ৪৮৫টি জলাশয় রয়েছে শহরাঞ্চলে। জলাশয়ের নিরিখে প্রথম পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশা ও অসম। জলাশয়গুলোর মধ্যে ৫৯.৫ শতাংশ পুকুর, ১৫.৭ শতাংশ ডোবা, ১২.১ শতাংশ জলাধার, জল সংরক্ষণ প্রকল্প ও বাঁধ রয়েছে ৯.৩ শতাংশ, সরোবর ০.৯ শতাংশ এবং বাকি ২.৫ শতাংশ অন্য ধরনের জলাশয় রয়েছে। দেশের সামগ্রিক জলাশয়ের ৬৩ শতাংশই রয়েছে এই রাজ্যগুলোতে।

উলটে প্রতি বছর জলের ব্যবহার বাড়ছে ১ শতাংশ। এই রিপোর্ট বলছে, ২০০০ সালের পরবর্তী সময় থেকে বিশ্বজুড়ে বন্যার হার বেড়েছে প্রায় আড়াই গুণ। সেই সঙ্গে একইভাবে বেড়েছে খরাও। যার বেশিরভাগটাই মূলত জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঘটছে।

২০১৯ সালের তথ্য অনুযায়ী, কলকাতা পুরসভা এলাকায় দৈনিক ৪৪৬ মিলিয়ন গ্যালন অর্থাৎ ২০২ কোটি লিটার পরিশ্রুত পানীয় জল উৎপাদন হয়। উৎপাদিত জলের পরিমাণ ধরলে প্রত্যেক বাসিন্দার ৪৫০ লিটার জল পাওয়ার কথা। অথচ অপচয়ের জেরে কলকাতা পুর এলাকায় ভূপৃষ্ঠ ও ভূগর্ভ মিলিয়ে দৈনিক প্রায় ৫০ কোটি লিটার জল নষ্ট হয়। শতাংশের হিসেবে যা দৈনিক উৎপাদিত জলের ২৮-৩০ ভাগ। এক হাজার লিটার পরিশ্রুত পানীয় জল উৎপাদন করতে চার টাকা খরচ হলে অপচয় হওয়া ৫০ কোটি লিটার জল তৈরি করতে ২০১৯ সালে খরচ হতো প্রায় ২০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ ২০১৯ সালের হিসেব অনুযায়ী, প্রতিদিন প্রায় ২৯ লক্ষ টাকার জল নষ্ট হয়েছে এ শহরে।

পশ্চিমবঙ্গের সুজলা সুফলা অংশটুকুর বাইরে বেরিয়ে কেউ কিছু দেখতে চায় না, ভাবতে চায় না। যেন পুরো রাজ্যের ছবিটাই এক রকম। এই ভাবের রাজ্যে ডুবে থাকা বাঙ্গালির মজ্জাগত। শুধু প্রবাসীরা নন, তাঁদের ব্যাপারটা তো তবু খানিকটা বোধগম্য— পশ্চিমবঙ্গের শহরাঞ্চলে বসবাসকারীরাও তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের বাইরে বাকি রাজ্যের বাস্তবতার মুখোমুখি হতে নারাজ। তাঁদের দৈনন্দিন জল-বাস্তবটুকু অতি সীমিত, কল খুললে জল, রাস্তায় পা ফেলতেই কাদা বাঁচিয়ে হাঁটা, পচা জলের বদগন্ধের সঙ্গে মানিয়ে চলা, এটা তাঁরা জীবনের অঙ্গ মাত্র মনে করেন। গ্রীষ্মকালে নাগরিকদের জন্য জলের বেশির ভাগটাই বাইরে থেকে তুলে এনে বসতির ভেতর জমা করা জল। কিছু ক্ষেত্রে উপচে পড়া জলের নিকাশি পথটিও নেই। অন্তত যতটা ও যেমনটি থাকার কথা, তেমনটি তো নেইই। অথচ সকলেই এসব নিয়ে বেশ উদাসীন। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের মতো এলাকাগুলোতে ইতিমধ্যেই জল না পাওয়ার হাহাকার শুরু হয়েছে। জল জীবন মিশন'-এর অগ্রগতিতে ভাঁটা পড়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লক্ষ্য, ২০২৬ সালের মার্চের মধ্যেই রাজ্যের প্রতিটি গ্রামীণ বাড়িতে নিরাপদ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া। কিন্তু অনেক জায়গায় প্রকল্প পৌঁছলেও জল পৌঁছায়নি বলেই অভিযোগ।

ভারতের জলসঙ্কট একটি জটিল সমস্যা যা একাধিক কারণে উদ্ভূত। দ্রুত নগরায়ণ, শিল্পায়ন এবং অস্থিতিশীল কৃষি পদ্ধতি জলের চাহিদা বৃদ্ধিতে অবদান রাখে। জলবায়ু পরিবর্তন পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করে তোলে, যার ফলে অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের ধরন তৈরি হয় এবং জলের উৎসগুলো প্রভাবিত হয়। অদক্ষ জল ব্যবস্থাপনা, অপর্যাপ্ত পরিকাঠামো এবং দূষণও একটি ভূমিকা পালন করে, যা জলের ঘাটতিকে একটি উদ্বেগজনক বিষয় করে তোলে।

ভারতে জল সংকটের মূলে রয়েছে ভূগর্ভস্থ জলের অত্যধিক ব্যবহার, অপর্যাপ্ত বৃষ্টির জল সংগ্রহ এবং জল সম্পদের অব্যবস্থাপনা। জলাশয়ের দূষণ এবং অদক্ষ কৃষি সেচ পদ্ধতি এই সমস্যাটিকে আরও বাড়িয়ে তোলে, যার ফলে জলের প্রাপ্যতা ও গুণমান হ্রাস পায়।

জলসংকট মানুষের জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায়। পরিষ্কার জলের অভাব স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলে, যা জলবাহিত রোগের কারণ হয়। মহিলাদের প্রায়শই দীর্ঘ দূরত্ব অতিক্রম করে জল আনার বোঝা বহন করতে হয়, যা শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক সুযোগগুলোকে সীমিত করে তোলে। ভারতে জল সমস্যা সামগ্রিক জীবনযাত্রার মানকে উল্লেখযোগ্য ভাবে প্রভাবিত করে।

দেশের সরকারি-বেসরকারি জলাশয়ের নিরিখে প্রথম পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ শীর্ষস্থান দখল করে নিয়েছে। গণনায় প্রকাশ যে শহরাঞ্চল, গ্রামাঞ্চল, ব্যক্তিগত অধিকারে থাকা জলাশয় ও মৎস্যচাষের ক্ষেত্রে প্রথম সারির পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান প্রথম। সেচের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের স্থান চতুর্থ। অন্য চারটি রাজ্য হলো ঝাড়খণ্ড, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা ও গুজরাট। গণনায় আরও প্রকাশ, শহরাঞ্চলের জলাশয়গুলোর ক্ষেত্রে প্রথম পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে ত্রিপুরা পঞ্চম স্থান অধিকার করে রয়েছে। দেশে সর্বমোট ২৪ লক্ষ ২৪ হাজার ৫৪০টি জলাশয় রয়েছে। এর মধ্যে ৯৭.১ শতাংশ অর্থাৎ,

২৩ লক্ষ ৫৫ হাজার ৫৫টি জলাশয় রয়েছে গ্রামীণ এলাকায় এবং কেবলমাত্র ২.৯ শতাংশ অর্থাৎ ৬৯ হাজার ৪৮৫টি জলাশয় রয়েছে শহরাঞ্চলে। জলাশয়ের নিরিখে প্রথম পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশা ও অসম। জলাশয়গুলোর মধ্যে ৫৯.৫ শতাংশ পুকুর, ১৫.৭ শতাংশ ডোবা, ১২.১ শতাংশ জলাধার, জল সংরক্ষণ প্রকল্প ও বাঁধ রয়েছে ৯.৩ শতাংশ, সরোবর ০.৯ শতাংশ এবং বাকি ২.৫ শতাংশ অন্য ধরনের জলাশয় রয়েছে। দেশের সামগ্রিক জলাশয়ের ৬৩ শতাংশই রয়েছে এই রাজ্যগুলোতে।

দেশের ইতিহাসে এই প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় জলশক্তিমন্ত্রক দেশজুড়ে জলাশয়গুলোর এই গণনা করল। প্রাকৃতিক জলাশয়-সহ মানবসৃষ্ট জলাশয় যেমন পুকুর, দীঘি, সরোবর প্রভৃতি-সহ দেশের জলসম্পদের এক সর্বাত্মক চিত্র এই গণনায় ধরা পড়েছে। এর পাশাপাশি, জলাশয় অধিগ্রহণের সমষ্টিগত পরিসংখ্যানও এতে পাওয়া যায়। এই গণনা শহর এবং গ্রামাঞ্চলের বৈষম্যকে একদিকে যেমন তুলে ধরেছে, অন্যদিকে তেমনই জলাশয় অধিগ্রহণের বিভিন্ন প্রকার চিত্রও এর মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। যাতে করে দেশের জলসম্পদের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক প্রকাশিত হয়েছে।

ষষ্ঠ ক্ষুদ্র সেচ গণনার সঙ্গে সমন্বয় বজায় রেখে কেন্দ্র-পোষিত 'সেচ গণনা' চালু করা হয় যাতে করে দেশের সমস্ত জলাশয়ের জাতীয় সর্বাত্মক তথ্যভাণ্ডার পাওয়া যায়। জলাশয়গুলোর অবস্থা, কী জাতীয় অধিগ্রহণ হয়েছে, তার ব্যবহার, কতটা জল সঞ্চয় করছে, জল সঞ্চয় ক্ষমতাই-বা কী— এই যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি তথ্যের মধ্যে ধরা পড়েছে। গ্রামাঞ্চল ও শহরের সমস্ত এলাকার ব্যবহৃত ও অব্যবহৃত যাবতীয় জলাশয়কে এর আওতাভুক্ত করা হয়েছে। জলাশয়গুলোর ব্যবহারগত প্রকৃতি কী, যেমন— সেচ, শিল্প, মৎস্যচাষ, গৃহস্থালি অথবা পানীয় জল হিসেবে ব্যবহৃত, আনন্দ-বিনোদনের স্বার্থে, ধর্মীয় কাজে, ভূগর্ভস্থ জল কতখানি পূর্ণ করা যাচ্ছে— এই সমস্ত বিষয় নিয়ে সামগ্রিক দিক এই গণনায় তুলে ধরাই ছিল লক্ষ্য। সাফল্যের সঙ্গে এই গণনা সম্পন্ন হয়েছে এবং সর্বভারতীয় ও রাজ্যভিত্তিক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে।

ভারত দেশটি বিভিন্ন বৈচিত্র্যপূর্ণ জলাশয় সমৃদ্ধ। যে কোনোরকম সুস্থায়ী উন্নয়নের জন্যই জল হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। জীবনের এটি একটি মৌলিক ও অপরিহার্য দিক। জল পুনর্ব্যবহারযোগ্য সম্পদ। কিন্তু চাহিদা ও ব্যবহারের মধ্যে ফারাক বৃদ্ধি পাওয়ায় এর প্রাপ্যতা সীমিত। ফলে, জল সংরক্ষণ এবং জলাধারগুলোতে জল ধরে রাখতে সমন্বিত প্রয়াসের প্রয়োজন। জলশক্তি মন্ত্রক এক্ষেত্রে নীতি-নির্দেশিকা তৈরি এবং কর্মসূচি রূপায়ণের দায়িত্ব বণ্টন করে যাতে করে দেশের জাতীয় সম্পদ হিসেবে জলসম্পদের উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও পরিচালনগত দিক নির্দিষ্ট করা হয়।

ভারতে মোট ৬ লক্ষ ৪৬ হাজার গ্রাম রয়েছে। সেখানে ১৯ কোটি ১৯ লক্ষ পরিবার বসবাস করে। জনসংখ্যা প্রায় ১৪০ কোটির বেশি। গত বছর জুন মাসে নীতি আয়োগের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে ৬০ কোটি মানুষের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জলের কোনো বন্দোবস্ত নেই। দেশে মাত্র ১৮ শতাংশ মানুষ পাইপলাইনে পানীয় জলের পরিষেবা পাচ্ছেন। মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, কেরালা ও গুজরাট-সহ বিভিন্ন রাজ্যে পানীয় জলের গভীর সংকট দেখা দিয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আর্সেনিক ও ফ্লোরাইডের উপস্থিতি দেখা যাচ্ছে। ভূগর্ভস্থ জল তুলে চাষাবাদ-সহ অন্যান্য কাজে লাগানোর জলস্তর ক্রমশ নীচে নেমে যাচ্ছে। প্রতিদিন আরও সমস্যা বাড়ছে। কোথাও কোথাও ট্রেনে চেপে ১৪-১৫ কিলোমিটার দূরে পানীয় জল কিনতে যেতে হয় মানুষকে। এখন বৃষ্টির জল ধরে রেখে পানীয় জল জোগানোর ব্যবস্থা না করা হলে সমস্যা আরও বাড়বে।

গ্রীষ্মকাল এলেই জলসংকট যেন চেনা রূপ ধারণ করে পশ্চিমাঞ্চলের নানা প্রান্তে। এবারে তো বেশ কয়েক মাস আগে থেকেই বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার নানা প্রান্তে নিদারুণ জলসংকটের ছবি উঠে আসে খবরের শিরোনামে। কল আছে কিন্তু জল নেই— অন্যান্য একাধিক জেলার পাশাপাশি পশ্চিমাঞ্চলের একাধিক জেলা থেকে লাগাতার এসেছে এই অভিযোগ।

পশ্চিমবঙ্গে ২০১১-১২ সালে 'জল ধরো-জল ভরো' নামে একটি কর্মসূচি চালু করা হয়েছিল, যার লক্ষ্য ছিল বৃষ্টির জলের বৃহৎ পরিমাণে সংগ্রহের মাধ্যমে মূল্যবান জলসম্পদ সংরক্ষণ করা এবং ক্ষুদ্র সেচ কাঠামো নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মূল্যবান জলসম্পদ উন্নত করা এবং ভূপৃষ্ঠের জলের প্রবাহ রোধ করা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জলসম্পদ তদন্ত ও উন্নয়ন বিভাগ এই কর্মসূচির আওতায় সকল ধরনের জলাশয় যেমন ট্যাঙ্ক, পুকুর, জলাধার, খাল পুনর্খনন করার জন্য নেতৃত্ব দিয়েছে, যেখানে বর্তমানে জল ধারণ ক্ষমতা কমে গেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের P&RD বিভাগ এবং অন্যান্য বিভিন্ন কর্মসূচির সঙ্গে একত্রে এবং ছাদে বৃষ্টির জল সংগ্রহের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ কৃত্রিমভাবে পুনর্নবীকরণের উপরও জোর দেওয়া হয়েছে। চেক ড্যাম, জল সংগ্রহ ট্যাঙ্ক এবং ভূপৃষ্ঠের প্রবাহ ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পগুলি ভূপৃষ্ঠের জলপ্রবাহ রোধে সহায়তা করবে এবং একই সঙ্গে রাজ্যের সেচ সম্ভাবনা বৃদ্ধি করবে। জলাশয়ের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি শুষ্ক মরসুমে প্রতিরক্ষামূলক সেচকে ব্যাপকভাবে সহায়তা করবে। কৃষিকাজের পাশাপাশি, এই জলাশয়ে মৎস্যচাষের পরিসর গড়ে উঠবে যা দরিদ্র কৃষকদের জন্য আয়ের আরও একটি পথ খুলে দেবে। সারা বছর ধরে জলের সহজলভ্যতা স্থানীয় গ্রামবাসীদের তাদের গৃহস্থালি ও পশুপালনেও সহায়তা করবে। 'জল ধরো-জল ভরো' কর্মসূচির লক্ষ্য বৃষ্টির জল সংরক্ষণ ও সেচের ক্ষেত্রে দক্ষ জল ব্যবহারের জন্য নাগরিকদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

আর অবহেলা নয়। সহজ কথায়, আগামীদিনে জলসংকটের বিষয়ে সবাইকে সচেতন করার জন্য সঙ্ঘবদ্ধভাবে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। জল সংরক্ষণই যে প্রধান কাজ সেটা সবাইকে বুঝতে হবে, আর সেটা বুঝতে পারলে তবেই এই সমস্যাকে রোধ করা হবে। জল থাকতেও জলের মর্ম মানুষ বুঝতে পারছে না। জীবনের সংকট মেটায় যে জল, সে জলই এখন সঙ্কটাপন্ন। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যদি কখনো বাধে, তা জমি বা দেশ দখল নিয়ে নয়, জলসম্পদের অধিকার নিয়ে বাধবে। তাই, কোমর বেঁধে জল অপচয় রোধ করতে নেমে পড়া ছাড়া দ্বিতীয় উপায় নেই। জল থাকলেই জীবন বাঁচবে। □

ভারতীয় কন্যাদের হিমালয় জয় তাদের অদম্য মানসিকতার পরিচায়ক

সিদ্ধি মিশ্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ২০১১ সালের ১১ এপ্রিল নয়াদিল্লি যাওয়ার জন্য লক্ষ্ণৌ থেকে পদ্মাবতী এক্সপ্রেসে ওঠেন অরুণিমা। উদ্দেশ্য ছিল সিআইএসএফের একটি চাকরির পরীক্ষা। ট্রেনে একদল দুষ্কৃতীর আক্রমণের শিকার হন তিনি। নিজেকে বাঁচাতে লাফ দেন ট্রেন থেকে। রেল লাইনে পড়ার পর তিনি দেখতে পান আরেকটি ট্রেন ধেয়ে আসছে তাঁর দিকে। তারপর আর তাঁর কিছু মনে নেই। এই ঘটনায় বাঁ পা-টি হারান তিনি। সংবাদমাধ্যমের প্রচারের ফলে খবরটি ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। একটি বেসরকারি সংস্থা তাঁর জন্য প্রস্থেটিক লেগের ব্যবস্থা করে দেয়। দিল্লি এইমসে তাঁর অপারেশন হয়। বাঁ পা প্রতিস্থাপন এবং ডান পায়ে স্টিল রড বসার পরেও অরুণিমা দমে গেলেন না বিন্দুমাত্র। মাউন্ট এভারেস্ট জয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। প্রথম এভারেস্ট-জয়ী ভারতীয় মহিলা বাচেন্দ্রী পালের কাছে গিয়ে তাঁর পরামর্শ নিলেন। উত্তর কাশীতে গিয়ে নিতে থাকলেন পর্বতারোহণের প্রশিক্ষণ। তারপর শুরু হলো অরুণিমার হিমালয় আরোহণ। ৫২ দিন ধরে চললো হিমালয়ের পথে তাঁর যাত্রা। ধীরে ধীরে চারটি বেস ক্যাম্প পেরিয়ে গিয়ে বাকি রইল শেষ ৩৫০০ ফুট উচ্চতা আরোহণ পর্ব। অদম্য সাহসে সেই 'ডেথ জোন' অতিক্রম করে ২০১৩ সালের ২১ মে, মাত্র ২৪ বছর বয়সে বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বত শিখর মাউন্ট এভারেস্ট জয় করেন অরুণিমা সিনহা। শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে এহেন কীর্তি স্থাপনের জন্য ২০১৫ সালে 'পদ্মশ্রী' সম্মানে ভূষিত হন তিনি।

কাঠমাণ্ডু থেকে হিমালয় পর্বতমালার সর্বোচ্চ শিখর মাউন্ট এভারেস্টের বেস ক্যাম্পের ট্রেক চিরকালই চ্যালেঞ্জিং ও রোমাঞ্চকর। ২০১৭ সালে বেঙ্গালুরু-নিবাসী বিনয় চন্দ্রের ত্রয়োদশ ও দ্বাদশ বর্ষীয়া দুই কন্যা গৌরী ও বেন্যা কাঠমাণ্ডু থেকে ট্রেকিং শুরু করে পৌঁছে যায় মাউন্ট এভারেস্টের বেস ক্যাম্পে। নেপাল জুড়ে সক্রিয় রয়েছে নারী ও শিশু পাচার চক্র। 'মৈতি নেপাল' নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা লড়াই চালাচ্ছে এই চক্রের বিরুদ্ধে। বহু অসহায় মেয়েকে উদ্ধার করে তাদের পুনর্বাসনের কাজ করে চলেছে এই সংস্থাটি। তাদের লড়াইয়ের পাশে দাঁড়াতে পর্বতারোহণের সংকল্প গ্রহণ করে গৌরী ও বেন্যা। শুরু হয় পর্বতারোহণের প্রশিক্ষণ। ওই বছর ৭ এপ্রিল নেপাল পৌঁছায় দুই কন্যা। দু'দিন পরেই তাদের ট্রেকিং শুরু হয় এবং ১৭ এপ্রিল তারা মাউন্ট এভারেস্ট বেস ক্যাম্প পৌঁছায়। যে সংস্থাটির কাজে সহযোগিতা করতে তাদের পর্বতারোহণ, সেই সংক্রান্ত একটি ব্যানার তাদের সঙ্গে ছিল। এই ব্যানারটি নিয়ে তারা এভারেস্ট বেস ক্যাম্পে পৌঁছে যায়। তাদের এই পর্বতারোহণের বিষয়টির প্রচারের মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাটির জন্য ক্রাউড ফান্ডিঙের ব্যবস্থাও হয়। গৌরী ও বেন্যার ট্রেকিঙের ফলে সংগৃহীত হয় প্রায় ৫ হাজার ডলার। এই অর্থ দুঃস্থ মহিলাদের জীবনের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হবে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। ২০১৭ সালের মে মাসে অন্ধ্রপ্রদেশের পর্বতারোহীদের একটি দল এভারেস্ট জয়ের লক্ষ্যে নেপাল পৌঁছায়। বিশাখাপত্তনম নিবাসী ভারতীয় নৌসেনা অফিসার এস. কার্তিকেয়নের নয় বছর বয়সি কন্যা কাম্যা কার্তিকেয়ন ছিল এই দলের অন্যতম সদস্যা। এই দলটির সঙ্গে প্রতিদিন ১২-১৪ কিলোমিটার রাস্তা ট্রেকিং করে ১৬ মে সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ১৮,২০০ ফুট উচ্চতায় মাউন্ট এভারেস্ট বেস ক্যাম্পে পৌঁছায় কাম্যা। মাত্র ন'বছর বয়সে স্থাপন করে এক বিশ্ব রেকর্ড। এই বছরেরই ৮ আগস্ট ২০,১৮৭ ফুট উচ্চতা-বিশিষ্ট লাদাখের স্টক কাংরি পর্বতশৃঙ্গটি জয় করে কাম্যা। ১০ বছরে পদার্পণের ২ দিন আগেই এই কীর্তি স্থাপন করে কাম্যা কার্তিকেয়ন। মাউন্ট কিলিমাঞ্জারো জয় তার পরবর্তী লক্ষ্য বলে জানায় এই ক্ষুদে পর্বতারোহী।

২০২৪ সালে এভারেস্ট বেস ক্যাম্প পৌঁছানোর লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করে আট সদস্য বিশিষ্ট পর্বতারোহীদের একটি দল। উল্লেখযোগ্য হলো সেই দলের সদস্য ছিল তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটোর নিবাসী, আট বছর বয়সি কন্যা যঝিনি রামকুমার এবং ২৯ বছর বর্ষীয়া রূপান্তরকামী মহিলা প্রীতিকা যশিনী। ১২ দিন ধরে টানা ট্রেকিং করে ১৬ মে সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ১৭,০০০ ফুট উচ্চতায় মাউন্ট এভারেস্ট বেস ক্যাম্পে পৌঁছায় যঝিনি।

২০২৪ সালেই ভোপাল নিবাসী আড়াই বছর বয়সি সিদ্ধি মিশ্রা মাউন্ট এভারেস্ট বেস ক্যাম্প ট্রেক সম্পূর্ণ করে। বাবা মহিম মিশ্রা ও মা ভাবনা দেওরিয়ার সঙ্গে এই ট্রেকিঙে সঙ্গী হয় ছোট্ট সিদ্ধি। গত বছরের ২২ মার্চ সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ১৭,৫৯৮ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এভারেস্ট বেস ক্যাম্পে পৌঁছায় সিদ্ধি। এক্সপিডিশন হিমালয় ডট কম প্রাইভেট লিমিটেড সংস্থার তরফে দেওয়া শংসাপত্র অনুযায়ী সবচেয়ে কম বয়সে হিমালয় বেস ক্যাম্পে পৌঁছানো পর্বতারোহী হলো সিদ্ধি।

ভারতীয় মেয়েদের অদম্য সাহস ও যেকোনো পর্বতশৃঙ্গ জয়ের প্রবৃত্তি প্রমাণ করছে তাঁদের অসাধারণ শক্তি। যেকোনো উচ্চতাকে জয়ে সক্ষম ভারতীয় মেয়েরা। তাঁদের স্থাপিত এই কীর্তি আগামী প্রজন্মের কাছে প্রেরণার উজ্জ্বল উৎস।

গল্প

নবাঙ্কুর

গরমের ছুটি

আজ স্কুল হয়েই গরমের ছুটি। কাল থেকে আর স্কুলে আসতে হবে না। ছুটির ঘণ্টা পড়তেই স্কুল জুড়ে সবাই আনন্দে উদ্বেল হয়ে হইহই করে উঠল। তারপর যে যার বাড়ির দিকে রওনা দিল। কেউ কেউ দোকানে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে ফুচকা, চপ, ঘুগনি খেতে শুরু করল।

রতন তো আগামীকাল দুপুরের ট্রেনেই মামার বাড়ি চলে যাবে ঠিক করেছে। বাড়ি যাওয়ার পথে

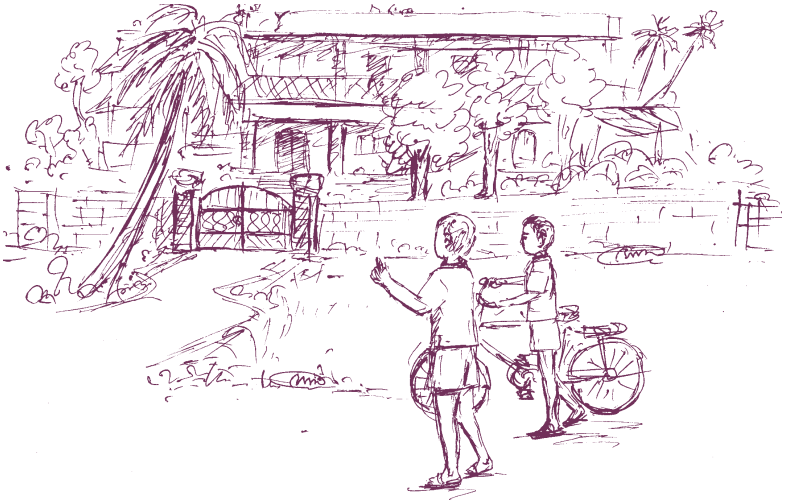

গোবিন্দকে বলল, আমার সঙ্গে চল, দশদিন ঘুরে আসবি। পিছন থেকে সঞ্জয় বলল, আমিও যাব। রতন একটা কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু সঞ্জয় তার আগেই সাইকেল চালিয়ে বেরিয়ে গেল। যেতে যেতে বলল, কালকে দেখা হবে। গোবিন্দ আর রতন একে অপরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

রতন বাড়িতে গিয়ে দেখে মা আর বোন জামাকাপড় গোছগাছ করছে। তার জন্য দুটো প্যান্ট আর জামা নিয়েছে কিন্তু নিজেদের কাপড়েই ব্যাগ ভর্তি। বোনের তো আবার সাজগোজের আলাদা একটা ব্যাগ। মা আবার মামাতো ভাই-বোনের জন্য জামা কিনেছে, সঙ্গে দিদার শাড়ি, দাদুর ধুতি আর সকলের জন্য কত ধরনের আচার। নিজে হাতে বানিয়েছে।

পরদিন সকাল সকাল মা রান্নায় বসে গেছেন। তাড়াতাড়ি খাওয়াদাওয়া সেরে স্টেশনে যেতে হবে। বেলা দশটায় খেতে বসে দেখি একটা থালা বেশি। কারণ জিজ্ঞেস করাতে জানা গেল, সন্ধ্যার দিকে সঞ্জয় কোনো এক ফাঁকে মায়ের কাছে বলে গেছে ও আমাদের সঙ্গে খাবে, ওদের বাড়িতে রান্নার অনেক দেরি। ছোট্ট একটা ব্যাগ নিয়ে হাসতে হাসতে সঞ্জয় এসে হাজির। ইচ্ছা না থাকলেও হাসিমুখে তাকে পাশে বসতে বলতে হলো।

খাওয়া দাওয়া সেরে স্টেশনে গিয়ে দেখি গোবিন্দ পৌঁছে গেছে। মায়ের আর বোনের ব্যাগটা একরকম জোর করেই নিয়ে প্লাটফর্মে এগিয়ে গেল সঞ্জয়। ট্রেন আসতেই আগে গিয়ে জায়গা ধরে রাখলো। সারা রাস্তা মা সঞ্জয়ের কত গুণগান করলেন। কিছুদিন আগে গড়ের পিছনের বাগানে আম পাড়তে গিয়ে কী শয়তানিই না করেছে, তার জন্য রাগ ছিলই, তার জায়গায় মায়ের মুখে প্রশংসা নিরুপায় হয়ে হজম করতে হচ্ছিল।

বিকালে ট্রেন পৌঁছলো সাগরদিঘীতে। রতনের মামা আর ভাই নিতে এসেছে। স্টেশনের বাইরে দুটো রিকশা দাঁড় করানো ছিল তাতেই সবাই বাড়ির উদ্দেশে রওনা হয়। রতনের মামাতো ভাই পার্থ দূরে একটা পুরনো বাড়ি দেখিয়ে বলে, ওটা হলো এখানকার জমিদার বাড়ি। বিরাট বড়ো, বাইরে থেকে দেখলে বোঝা যাবে না। কিন্তু এখন কেউ থাকে না। সন্ধ্যার পর কেউ এদিকে আসে না। অনেকেই নাকি তেনাদের দেখতে পেয়েছে। সঞ্জয় বলে ওঠে, তেনারা কারা? সোজাসুজি বললেই তো পারিস ভূতের বাড়ি। কিন্তু ওখানে কখন যাবি সেটা বল। তখনই গোবিন্দ বলে, আমি যাব না বলে দিলাম।

মামাবাড়ি পৌঁছেই ব্যাগপত্র রেখে সবাই পুকুরে গেল হাত-পা ধুতে। গোবিন্দ জলে নামতেই তার ঘাড়ের উপর দিয়ে কী যেন এসে জলে পড়ল, আর তাতেই পা হড়কে জলে। ওদিকে জল থেকে মুখ বের করে দাঁত বের করে হাসতে শুরু করেছে— শ্রীমান সঞ্জয়। পাড়ে দাঁড়িয়ে বাকিরাও হাসতে শুরু করেছে। দুজনের কথা বলা বন্ধ থাকলেও সঞ্জয়ের কাণ্ডকারখানা দেখে সবাই হেসে অস্থির। কদিন ধরে জোরদার খাওয়াদাওয়া আর ঘোরাঘুরি চলতে লাগল। পার্থ তো রতন, গোবিন্দকে ভুলে সঞ্জয়ের সঙ্গে সাইকেলে করে পাড়া-জঙ্গল ঘুরে বেরাচ্ছে। অবশ্য সাইকেলটা সঞ্জয়ের হাতেই, পার্থ শুধু পিছনে বসে রাস্তা বলে দেয়।

একদিন সঞ্জয় বিকেলে সাইকেল নিয়ে একাই বেরিয়েছে কিন্তু সন্ধ্যা পেরিয়ে গেলেও বাড়িতে ফিরল না। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হলেও তার কোনো খবর পাওয়া গেল না। ছোটোরা সবাই খাওয়াদাওয়া করলেও বড়োরা শান্তিতে বসতেই পারছিল না। সকলে পার্থকে জিজ্ঞেস করল সে কিছু জানে কিনা। সে বলে, সঞ্জয় নাকি যাওয়ার সময় টর্চ আর দড়ি নিয়ে গেছে। এটা শুনে সবাই আরও অস্থির হলো। পাড়ার কয়েকজন মিলে খুঁজতে বের হলো। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাদের খালি হাতেই ফিরতে হলো।

পরদিন সকালে বাড়ির বাইরে সাইকেলের বেল বাজার আওয়াজ পেয়ে দরজা খুলেই দেখে শ্রীমান সঞ্জয়। সাইকেলে বস্তা ভর্তি আম, লিচু, ডাব, কলা আরও কত কী। পার্থ আসতেই সাইকেলটা ধরতে বলে সোজা ভেতরে ঢুকে গেল। বলল খুব ঘুম পাচ্ছে, রাতে মশার কামড়ে ঘুমটা ভালো হয়নি। রতনের মামা জিজ্ঞেস করলেন সারা রাত কোথায় ছিলে? সঞ্জয় বলে, ওই তো জমিদার বাড়ির বাগানে ফল পেড়ে হাঁপিয়ে গেছিলাম, তাই দোতলার একটা ঘরে জানালা দরজা খুলে খাটের উপর শুয়ে পড়লাম। এতো সুন্দর হাওয়া আসছিল যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আর বেশি কথা না বাড়িয়ে সঞ্জয় বারান্দায় খাটের উপর শুয়ে পড়ল।

আজ জামাইষষ্ঠীর দিন ভোরের ট্রেন ধরে রতনের বাবা এসে পৌঁছলেন। তিনি অনেক বছর পর শ্বশুরবাড়িতে এলেন। সারাদিন বিভিন্ন অনুষ্ঠান, জোরদার খাওয়াদাওয়া আর উপরি পাওনা ছিল সঞ্জয়ের নানান মজার সব কাণ্ডকারখানার গল্প। পরদিন সকালে আবার সকলে মিলে বাড়ির উদ্দেশে রওনা। স্টেশন থেকে ট্রেন ছেড়ে দিল, রতনের মামা ট্রেনের সঙ্গে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে থেমে গেলেন। পার্থ অনেকটা ছুটে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। হাত নেড়ে সবাইকে বিদায় জানালো।

সোমকান্তি

জাতীয় উদ্যান

আনামুদি শোলা

আনামুদি শোলা জাতীয় উদ্যান কেরালা রাজ্যের ইদুক্কি জেলার পশ্চিমঘাট পর্বতমালার ধারে আবস্থিত। এই উদ্যান ৭.৫ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। উদ্যানটি কেরালা বন ও বন্যপ্রাণী বিভাগ এবং মুন্নার বন্যপ্রাণী বিভাগের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। পাম্বার নদী এই উদ্যানের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে থুভানন জলপ্রপাত তৈরি করেছে। এই উদ্যানে বাঘ, চিতাবাঘ, হাতি, নীলগিরি তাহর, বাইসন, ডোরাকাটা হরিণ, গৌড়, জায়ান্ট গ্রিজল্ড কাঠবেড়ালি, সম্বর, উড়ন্ত কাঠবেড়ালি, স্লথ ভল্লুক, বন্য শুয়োর, বনবেড়াল, নেকড়ে, বন্য কুকুর এবং বিভিন্ন প্রজাতির বাঁদর দেখা যায়। এই উদ্যানে ১৭৪ প্রজাতির ভেষজ ও গুল্ম এবং ৬২ প্রজাতির বৃক্ষ রয়েছে। এই উদ্যান প্রকৃতিপ্রেমীদের জন্য একটি আকর্ষণীয় স্থান।

এসো সংস্কৃত শিখি-৭০

অদ্য / শ্বঃ / পরশ্ব / প্রপরশ্ব।
আজ/ আগমীকাল/ আগামী পরশু/ আগামী তরশু।

অদ্য সোমবাসরঃ – আজ সোমবার।

কদা সোমবাসরঃ ? – কবে সোমবার?

শ্বঃ মংগলবাসরঃ – আগামীকাল মঙ্গলবার।

পরশ্বঃ বুধঃবাসরঃ– পরশু বুধবার।

প্রপরশ্বঃ গুরুবাসরঃ – আগামী তরশু বৃহস্পতিবার।

ভালো কথা

বৃষ্টিভেজা

কদিন থেকে খুব গরম পড়েছিল। মনে হচ্ছিল রাত্রিবেলা পাখাগুলোও ধীরে ধীরে ঘুরছে। সেদিন রাত্রি ন'টার সময় আমরা রাতের খাবার খেতে বসেছিলাম, তখন হঠাৎ জোরে হাওয়া বইতে শুরু করল। বাবা বললেন, তাড়াতাড়ি খেয়ে ওঠো, বৃষ্টি আসবে। খাওয়ার পর হাত-মুখ ধুতে না ধুতেই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি এল। সবাইকে অবাক করে বাবা উঠোনে নেমে বৃষ্টিতে ভিজতে লাগলেন। আমাদেরও হাত ধলে টেনে নামালেন। আমরাও বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে নাচতে শুরু করলাম। একটু পরে মা-ও উঠোনে নেমে আমাদের সঙ্গে ভিজতে শুরু করলেন। খুব জোরে আধঘণ্টা মতো বৃষ্টি হয়ে ছেড়ে গেল। বাবা বললেন প্রথম বৃষ্টির জলে ভেজা শরীরের পক্ষে খুব ভালো। পরদিন সকালে দেখলাম, আমার ও ভাইয়ের সারা শরীরে যে ঘামাচি হয়েছিল সেগুলো আর নেই। বাবা বললেন, রোজ রোজ ভিজতে নেই, শুধু প্রথম বৃষ্টিতে ভেজা খুব ভালো।

শ্রেয়া ঘোষাল, ষষ্ঠ শ্রেণী, বড়জোড়া, বাঁকুড়া

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) দ রু বা লা

(২) ল সো আ সা

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) ন ন ম স লি ব

(২) য ন শো ন্দ দা ন

১৯ মে সংখ্যার উত্তর

(১) খোলাবাজার (২) খোশমেজাজ

১৯ মে সংখ্যার উত্তর

(১) ক্ষমতাসম্পন্ন (২) কুসুমমালিকা

(১) বর্ণিনী সরকার, বিএস রোড, ইবি, মালদা। (২) শিবম রায়, রায়নগর, ডায়মন্ড হারবার, দঃ ২৪ পরগনা (৩) শোভা হালদার, নিমতিতা, মুর্শিদাবাদ (৪) শ্রেয়ান গুপ্ত, স্কুলডাঙ্গা, বাঁকুড়া

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

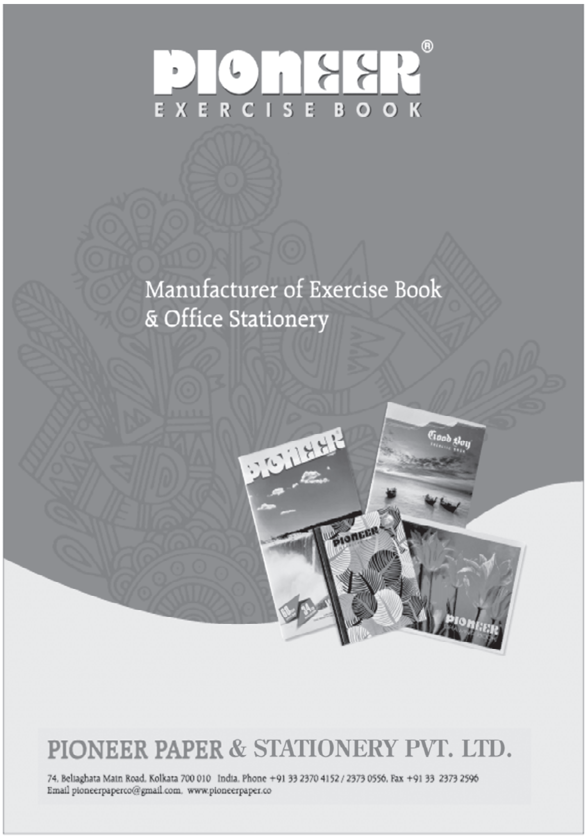

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

★ RETIREMENT PLANNING.
★ CHILDREN EDUCATION FUND.
★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
★ WEALTH CREATION.
★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206 9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

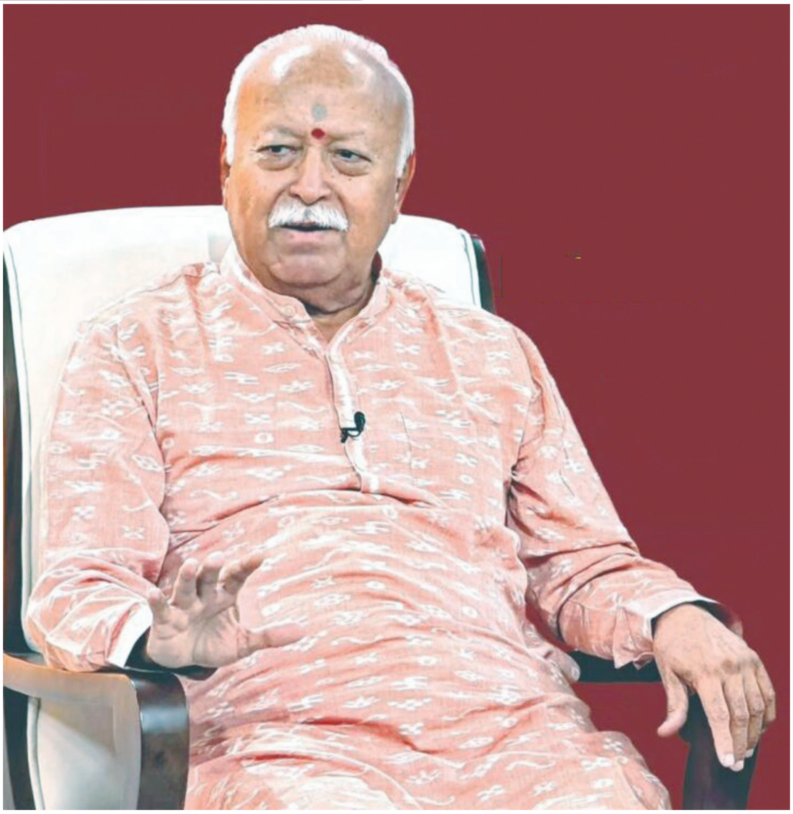

ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজের সংরক্ষণ করে রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীণ বিকাশই সঙ্ঘের লক্ষ্য : ডাঃ মোহনরাও ভাগবত

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এবছর বিজয়াদশমীতে শতবর্ষ পূর্ণ করবে। বর্তমানে সঙ্ঘ এক অসাধারণ, সর্বস্পর্শী এবং রাষ্ট্রব্যাপী সংগঠনে পরিণত হয়েছে। অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার পর সঙ্ঘের যে সংকল্প ও আহ্বান সামনে এসেছে, তাতে এই যাত্রাপথের মূল্যায়ন, আত্মচিন্তন এবং সঙ্ঘের মূল আদর্শের প্রতি পুনরায় সমর্পণের আহ্বান করা হয়েছে। সঙ্ঘের কার্যপ্রণালী কেমন, বিস্তার কতখানি, কোথায় কোথায় বাঁক নিতে হয়েছে, কোন কোন ঘটনা অতিক্রম করে সঙ্ঘ আজ এই রূপে আমাদের সামনে দাঁড়িয়েছে; সঙ্ঘের বিরোধীরা কী ভাবছেন আর বিরোধীদের সম্পর্কে সঙ্ঘ কী ভাবছে, সঙ্ঘের বর্তমান স্বরূপ কী এবং সঙ্ঘ আগামীকাল কী হবে— এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর এবং আগামী যাত্রাপথ জানতে অর্গানাইজার পত্রিকার সম্পাদক প্রফুল্ল কেতকর, পাঞ্চজন্য পত্রিকার সম্পাদক হিতেশ শঙ্কর, মরাঠী সাপ্তাহিক বিবেকের সম্পাদক অশ্বিনী ময়েকর এবং মালয়ালম দৈনিক জন্মভূমির সহ সম্পাদক এম বালকৃষ্ণান রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহনরাও ভাগবতের সঙ্গে বিস্তৃত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। তারই সংক্ষিপ্তসার এই সংখ্যায় প্রকাশ করা হলো। উল্লেখ্য, এই সাক্ষাৎকার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধিসভা (২২-২৪ মার্চ, ২০২৫)-র পটভূমিতে গৃহীত এবং অপারেশন সিঁদুর অভিযানের আগে সম্পন্ন হয়েছে।

□ আপনি একজন স্বয়ংসেবক ও সরসঙ্ঘচালক হিসেবে সঙ্ঘের ১০০ বছরের যাত্রাকে কী চোখে দেখছেন?

● ডাঃ হেডগেওয়ার সঙ্ঘের কাজ অনেক ভেবে-চিন্তে শুরু করেছিলেন। দেশের সামনে যেসব সমস্যা দেখা যায়, সেগুলি কীভাবে সমাধান হতে পারে, তা প্রয়োগ রূপে গ্রহণ করা হয় এবং তা সফলও হয়। সঙ্ঘের কার্যপদ্ধতির দ্বারা কাজ হতে পারে এবং চলার পথে আসা সমস্ত বাধা অতিক্রম করে সঙ্ঘ এগিয়ে যেতে পারবে এই বিশ্বাস পাকাপোক্ত হতে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত সময় লেগে যায়। তারপরেই সঙ্ঘের দেশব্যাপী বিস্তার এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বয়ংসেবকদের প্রবেশ ঘটতে শুরু করে।

পরবর্তী চার দশক ধরে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে কাজের মাধ্যমে নিজের কর্তৃত্ব, ব্যক্তিত্ব, চরিত্রের দ্বারা সমাজের বিশ্বাস অর্জন করেছে এবং ১৯৯০-এর পর সঙ্ঘের ভাবনা ও গুণবত্তার উপর নির্ভর করে দেশের শাসনভার গ্রহণ করতে পারে, তাও করে দেখিয়েছে। আগামীদিনে এই গুণাবলী ও ভাবনাকে অবলম্বন করে সমগ্র সমাজকে সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে সৎভাবে ও নিঃস্বার্থ বুদ্ধিতে কাজ করতে হবে এবং দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

ফ ঃ ৬

"সত্য, শুচিতা, করুণা ও তপস্যার ভিত্তিতে মানবজীবনের পুনর্রচনা হোক। সারা বিশ্বের এটি চাহিদা এবং ভারত তার পথ প্রদর্শক—এটি অপরিহার্য। সঙ্ঘকাজের গুরুত্বকে অনুভব করে 'আমি ও আমার পরিবার'—এই ভাবনার উর্ধ্বে উঠে, নিজের জীবনে উদাহরণ সৃষ্টি করে, সক্রিয় হয়ে সকলকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে আমাদের যেতে হবে—এটিই আজ প্রয়োজন।"

◻ ১০০ বছরের যাত্রাপথে সঙ্ঘের গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক কী ছিল?

● সঙ্ঘের কাছে কিছুই ছিল না। আদর্শের মান্যতা ছিল না, প্রচারের মাধ্যম ছিল না, সমাজের মধ্যে কেবল উপেক্ষা ও বিরোধিতাই ছিল। কার্যকর্তাও ছিল না, সংগণক যন্ত্রে তথ্য অনুসন্ধান করলে জানা যেত যে, এই সংগঠন জন্মলগ্নতেই শেষ যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু দেশ বিভাজনের সময় হিন্দুদের যেভাবে রক্ষা করা হয়েছে এবং সঙ্ঘের উপর নিষেধাজ্ঞার মতো কঠিন পরিস্থিতি থেকে যেভাবে সফলতার সঙ্গে বেরিয়ে এসেছে তাতে ১৯৫০ সালেই সবার মনে বিশ্বাস জন্মায় যে সঙ্ঘকাজ চলবে এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। এই পদ্ধতিতে হিন্দুসমাজকে সংগঠিত করা যেতে পারে।

এরপরে সঙ্ঘের কাজ আরও বিস্তার ঘটে এবং তা সমাজ বুঝতে পারল ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থার সময় স্বয়ংসেবকদের ভূমিকা দেখে। পরবর্তীকালে একাত্মতা রথযাত্রা, কাশ্মীর সম্বন্ধীয় জন আন্দোলন, শ্রীরামজন্মভূমি মুক্তি আন্দোলন এবং বিবেকানন্দের ১৫০ তম জন্মজয়ন্তীর মতো বিভিন্ন অভিযানের দ্বারা এবং সেবা কার্যের ব্যাপক বৃদ্ধির ফলে সঙ্ঘের প্রতি বিশ্বাসযোগ্যতার ভাব সমাজের মধ্যে ভালোমাত্রায় বিস্তার ঘটে।

◻ ১৯৪৮ ও ১৯৭৫ দু'বার সঙ্ঘ নিষিদ্ধ হওয়ার পর সংগঠন তা থেকে কী শিক্ষালাভ করেছে?

● দুটি নিষেধাজ্ঞার পেছনেই রাজনীতি ছিল। যারা নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল তারাও জানত যে সঙ্ঘের দ্বারা কোনো ক্ষতি হয় না, বরং লাভই হয়। এত বড়ো সমাজে স্বাভাবিক ভাবনার বিপরীতে নিজের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ক্ষমতাসীন দল এই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। প্রথমবার নিষিদ্ধ হওয়ার সময়ে পুরো পরিস্থিতি সঙ্ঘের বিরুদ্ধে ছিল। সঙ্ঘ শেষ হয়ে যেতে পারত। কিন্তু সমস্ত বাধাবিপত্তি কাটিয়ে ১৫-২০ বছরের মধ্যে আগের অবস্থা শুধু নয়, তার চেয়েও ভালো অবস্থায় এসে দাঁড়াল। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক যারা কেবল শাখা চালাতেন, সমাজের কোনো কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতেন না, তাঁরাই ধীরে ধীরে সমাজের বিভিন্ন কার্যকলাপে সহভাগী হয়ে নিজেদের ভূমিকা প্রতিষ্ঠা করতে থাকেন। ১৯৪৮ সালের পর সঙ্ঘের এটাই লাভ হয়েছে যে, সঙ্ঘ নিজের সামর্থ্য বুঝতে পারে এবং সমাজে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে পরিবর্তনের জন্য স্বয়ংসেবকরা পরিকল্পনা করে অগ্রসর হয়। সঙ্ঘের ভাবনায় প্রথম থেকেই নিশ্চিত ছিল যে সঙ্ঘকাজ কেবল একঘণ্টা শাখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং বাকি ২৩ ঘণ্টা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সার্বজনিক ও কর্মক্ষেত্রে নিজের কার্যকলাপের মধ্যে সঙ্ঘের সংস্কারের অভিব্যক্তি প্রকাশ করা।

১৯৭৫ সালে আবার নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হলে সঙ্ঘের বিরাট শক্তিকে সমাজ অনুভব করে। যখন গণ্যমান্য ব্যক্তিরা হতাশ হয়ে চুপ করে বসে পড়েছিলেন, তখন সাধারণ স্বয়ংসেবকদের মনে এই বিশ্বাস ছিল যে এই সংকট কেটে যাবে এবং সকলে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে। ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থার সময় সঙ্ঘ কেবল নিষেধাজ্ঞাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থের একটা সুযোগ হিসেবে

ব্যবহার না করে গণতন্ত্র রক্ষার জন্য কাজ করেএবং সঙ্ঘের ওপর টীকাটিপ্পনী করা লোকেদেরও পাশে দাঁড়ায়। ওই সময় সমাজে বিশেষ করে চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সঙ্ঘের আদর্শের প্রতি বিশ্বাস জন্মেছে। জরুরি অবস্থার পর সঙ্ঘের কাজ অনেক গুণে বৃদ্ধি পায়।

□ ভৌগোলিক ও সংখ্যার বিচারে সঙ্ঘ বেড়ে চলেছে। তা সত্ত্বেও গুণসম্পন্ন কাজ এবং স্বয়ংসেবকদের গুণাবলী বিকাশের জন্য প্রশিক্ষণ নিয়মিত ও সুব্যবস্থিতভাবে চলছে, এর কারণ কী?

● গুণমান ও সংখ্যা দুইয়ের মধ্যে যে কোনো একটি বৃদ্ধি করলে গুণও বাড়বে না এবং সংখ্যাও স্থায়ী হবে না। একথা ভেবে সঙ্ঘ প্রথম থেকেই এই বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য দিয়েছে যে সঙ্ঘ সম্পূর্ণ সমাজকে সংগঠিত করতে চায়। কিন্তু সংগঠিত করার একটি অর্থ রয়েছে। একজন ব্যক্তিকে কীভাবে নির্মাণ করা হবে, সেই সব ব্যক্তিকে নিয়ে সংগঠন কেমন হওয়া প্রয়োজন, 'আমরা' এই ভাবনা কীভাবে নির্মাণ হবে, এই সব বিষয়ে প্রথম থেকেই কিছু মানদণ্ড তৈরি করা হয়। এই সমস্ত মানদণ্ড না মেনে সংখ্যা বাড়ানো বা মানদণ্ডের সঙ্গে আপোশ না করার অর্থ মানুষকে সংগঠনের বাইরে রাখা নয়। একটা উদাহরণ। একটা বড়ো সংগঠনের প্রথম দিককার কথা। ওই সংগঠনে সমাজবাদী চিন্তাধারার এক ব্যক্তি কার্যকর্তা হন। তার ঘনঘন সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস। প্রথমবার কোনো প্রশিক্ষণ বর্গে এসেছেন। বর্গে সিগারেট তো দূরের কথা, কেউ সুপারিও খেত না। সে সারাদিন ছটফট করতে থাকে। রাতেও তার ঘুম আসছে না। ইতিমধ্যে সংগঠন সম্পাদক এসে তাকে বললেন, ঘুম আসছে না তো বাইরে চলুন একটু ঘুরে আসি। বাইরে এসে তিনি ওই ব্যক্তিকে বলেন, ওই মোড়ের দোকানে সিগারেট পাওয়া যাবে। মনভরে সিগারেট খেয়ে ফিরে আসুন, বর্গের ভিতরে সিগারেট খাওয়া যাবে না। ওই ব্যক্তি সংগঠনে টিকে গেলেন, বড়ো কার্যকর্তা হলেন এবং সিগারেটও ছেড়ে দিলেন।

ওই কার্যকর্তা সংগঠনটিকে ওই প্রদেশে উল্লেখযোগ্য স্থানে পৌঁছে দেন। যে ব্যক্তি যেরকম সেইভাবেই তাকে গ্রহণ করা উচিত । এইরকম নমনীয়তা আমরা রাখি। কিন্তু আমরা যেমনটি চাই তেমনভাবে গড়ে নেওয়ার বন্ধুত্বপূর্ণ কৌশলও আমরা জানি। এরকম সাহস ও ক্ষমতা আমরা রাখি। এই কারণে সংখ্যা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে গুণবত্তাও বজায় রয়েছে। সেই কারণে সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গুণবত্তা বজায় থাকে। আমরা সংগঠনে গুণাবত্তা চাই । কিন্তু আমাদের সম্পূর্ণ সমাজকেই গুণসম্পন্ন করতে হবে, সেটাও আমরা মাথায় রাখি।

□ সঙ্ঘ আজও ডাক্তারজী ও শ্রীগুরুজীর মূল ভাবনার উপর ভিত্তি করে চলছে। পরিস্থিতি সাপেক্ষে তার মধ্যে কীভাবে রূপান্তরণ করা হয়েছে?

● ডাক্তারজী, শ্রীগুরুজী বা বালাসাহেবজীর ভাবনা সনাতন পরম্পরা বা সংস্কৃতির বাইরে নয়। গভীর চিন্তন এবং কার্যকর্তাদের প্রত্যক্ষ অনুভব থেকেই সঙ্ঘের কার্যপদ্ধতি দৃঢ় হয়েছে এবং চলছে। প্রথম থেকেই এর মধ্যে গ্রন্থনিষ্ঠা, ব্যক্তিনিষ্ঠা বা অন্ধানুকরণের কোনো স্থান নেই। আমরা আদর্শনিষ্ঠ। আমরা মহাপুরুষদের গুণ বা তাঁদের দেখানো পথ অনুসরণ করি কিন্তু দেশ-কাল-পরিস্থিতি

"সারা দেশে অনেক বড়ো মহিলা সম্মেলন হয়েছে, তাতে লক্ষ লক্ষ মহিলা অংশগ্রহণ করেছিলেন। এসব কাজে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সমর্থন ও সহযোগিতা রয়েছে। আমরা মনে করি মহিলাদের উন্নতি পুরুষরা করতে পারবেন না। মহিলাদেরই মহিলাদের উন্নতি করতে হবে, আর তাতেই সকলের উন্নতি হবে। এজন্য আমরা এবিষয়কেই প্রাধান্য দিই এবং তাঁরা যা করতে চান তার জন্য তাদের সহযোগিতা করি।"

অনুযায়ী নিজের পথ নিজেদেরই ঠিক করে নিয়ে চলতে হয়। এরজন্য নিত্যানিত্য বোধ থাকা চাই। সঙ্ঘের মধ্যে নিত্য কী? একবার বালাসাহেবজী বলেন,'হিন্দুস্থান হিন্দু রাষ্ট্র', এই কথা বাদ দিয়ে বাকি সবকিছু সঙ্ঘে বদল হতে পারে। সমগ্র হিন্দু সমাজ এই দেশের প্রতি দায়বদ্ধ। এই দেশের স্বভাব ও সংস্কৃতি হিন্দুদেরই সংস্কৃতি। তাই এটা হিন্দুরাষ্ট্র। একথার উপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে সব কাজ করতে হবে। এই জন্যই স্বয়ংসেবকের প্রতিজ্ঞাতে 'আমাদের পবিত্র হিন্দুধর্ম, হিন্দু সংস্কৃতি ও হিন্দু সমাজের সংরক্ষণ করে হিন্দুরাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি'র কথা বলা হয়েছে। হিন্দু শব্দের অর্থও ব্যাপক। তার চৌহদ্দির মধ্যে থেকে নিজের লক্ষ্য স্থির রেখে দেশ-কাল-পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবর্তন করার পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে। প্রতিজ্ঞার মধ্যে 'আমি সঙ্ঘের একজন ঘটক' একথাও বলা হয়েছে। ঘটক অর্থাৎ সঙ্ঘের ধারক ও বাহক, সঙ্ঘের ক্ষুদ্ররূপ এবং অভিন্ন অঙ্গ। তাই ভিন্ন ভিন্ন মত হওয়া সত্ত্বেও আলোচনার সময় প্রত্যেকের নিজস্ব মতামত পোষণ করার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। একবার সিদ্ধান্ত হওয়ার পর সবাই নিজ নিজ মত ওই সিদ্ধান্তে বিলীন করে এক লক্ষ্যে চলতে থাকেন। যা সিদ্ধান্ত হয় তা সকলের জন্য মান্য। এইজন্যই সবার কাজ করার স্বাধীনতা রয়েছে এবং সবার লক্ষ্যও এক। নিত্যকে আমরা মেনে চলি আর অনিত্যকে দেশ-কাল-পরিস্থিতি অনুযায়ী বদল করে নিই।

□ সঙ্ঘকে যারা বাইরে থেকে দেখছেন, যারা অনুভব করতে পারেন না, তারা সংগঠনের ধাঁচা বুঝতে পারেন। কিন্তু এই দীর্ঘ যাত্রাপথে বিচার-বিমর্শ ও আত্মচিন্তনের প্রক্রিয়া কীরকম রয়েছে?

● তার এক পদ্ধতি তৈরি করা হয়েছে, যার উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় স্থির রয়েছে। কিন্তু তার ব্যবহারের পদ্ধতি পৃথক হতে পারে। ধাঁচা তো বদল হতেই পারে কিন্তু ভেতরের বিষয়টি অপরিবর্তনীয়। পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে মনোস্থিতিরও গুরুত্ব রয়েছে। এজন্য আমাদের প্রশিক্ষণে দেশের পরিস্থিতি, সমস্যা ইত্যাদি বিষয়ে অনেক ভাবনাচিন্তা করা হয়ে থাকে। তার সঙ্গেই তাল রেখে সেই প্রসঙ্গে স্বয়ংসেবকদের কেমন হওয়া প্রয়োজন, সংগঠনের জন্য কী কী গুণ আবশ্যক, নিজের মধ্যে সেই গুণের বিকাশের জন্য আমরা কী কী করে থাকি ইত্যাদি বিষয়েও ভাবনাচিন্তা করা হয়। সঙ্ঘের প্রার্থনার মাধ্যমে সামূহিক সংকল্প এবং প্রতিজ্ঞার মাধ্যমে ব্যক্তিগত সংকল্প প্রতিদিন স্মরণ করা হয়। স্বয়ংসেবকের অর্থই হলো নিজের থেকে শুরু করা। সঙ্ঘের মধ্যে 'ঘটক' শব্দের অর্থ হলো, 'যেরকম আমি সেরকমই সঙ্ঘ; আর যেরকম সঙ্ঘ সেরকমই আমি।' যেমন সমুদ্রের প্রতিটি জলবিন্দু সমুদ্রের মতোই এবং সমস্ত জলবিন্দু মিলেই সমুদ্র তৈরি হয়। এই 'এক' ও 'পূর্ণ'-এর সম্পর্ক প্রথম থেকেই সঙ্ঘের মধ্যে চলে আসছে। স্বয়ংসেবকদের আত্মচিন্তন নিরন্তর চলতে থাকে। সফলতার শ্রেয় সম্পূর্ণ সঙ্ঘের হয়ে থাকে। ব্যর্থতার পরিস্থিতিতে আমার কোথায় ঘাটতি—এই চিন্তা প্রত্যেক স্বয়ংসেবক করে থাকেন। এই প্রশিক্ষণই স্বয়ংসেবকরা পেয়ে থাকেন।

□ সমাজ বদলেছে, জীবনশৈলী বদলেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে সঙ্ঘের নিত্য শাখার মডেল কি তেমনই প্রভাবী নাকি এর কোনো বিকল্প ব্যবস্থাও রয়েছে?

● শাখার কার্যক্রমের বিকল্প হতে পারে, আর আমরা তা স্বীকারও করি। কিন্তু শাখার যে তত্ত্ব রয়েছে—একত্রিত হওয়া, সদ্‌গুণের জন্য সামূহিক সাধনা করা এবং প্রতিদিন মনের মধ্যে এই সংকল্প জাগ্রত করা যে আমরা মাতৃভূমির জন্য কাজ করছি, রাষ্ট্রের পরমবৈভবের জন্য কাজ করছি। এই যে ভিত্তি —একত্রিত হওয়া, একে অপরের সহযোগিতা করা—এটাই মূলকথা। এর কোনো বিকল্প নেই। সাধারণ মানুষ সাধারণই। সেই সাধারণ মানুষ তখনই অসাধারণ হয়ে ওঠেন যখন তারা সংগঠিত থাকেন। তখন সাধারণ মানুষই অসাধারণ কাজ সম্পন্ন করতে পারেন, অসাধারণ ত্যাগ স্বীকারও করতে পারেন। তার জন্য যে পরিবেশের দরকার এবং তার সঙ্গে নিজেকে সম্মিলিত করা। নিজের জীবনে উদাহরণ ও আত্মীয়তার ভাব সৃষ্টি করা---এটাই পরিবর্তনের মাধ্যম, অন্য কিছু নয়।

পৃথিবীর যেখানেই যাওয়া যাক না কেন, সেখানে কোনো না কোনো পরিবর্তন হয়েছে, তার একটা মডেল থাকে। যাতে প্রথমে নিজেকে পরিবর্তন করতে হয়। তা দেখে অন্যের মধ্যে পরিবর্তন হয়। এটা দূরে থেকে হয় না। অর্জন করতে হয়। নিকটে আসতে হয়। মহাপুরুষ অনেক আছেন, তাঁদের সম্পর্কেও জানি। তাঁদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আছে, সম্মান আছে। কিন্তু আমি যাঁর সান্নিধ্যে আছি, তিনি যেরকম আচরণ করেন, আমি সেরকমই করি। আমি সেটাই করি যার সান্নিধ্যে আমি রয়েছি। আমার বন্ধু কিন্তু আমার থেকে একটু ভালো, আমি তাকেই অনুসরণ করি—এটাই পরিবর্তনের প্রামাণ্য পদ্ধতি। এরমধ্যে কোনো বদল হয়নি। তাই শাখার আর কোনো দ্বিতীয় মডেল নেই। কার্যক্রম এবং বাকি সবকিছু বদল হতে পারে। শাখার সময় বদল হয়, স্বয়ংসেবকদের গণবেশেরও পরিবর্তন হয়েছে। শাখায় ভিন্ন ভিন্ন কার্যক্রমের অনুমতি প্রথম থেকেই আছে কিন্তু শাখার কোনো বিকল্প নেই। শাখা কখনো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বর্তমানে আমাদের শাখার মডেলের ওপর বহু উন্নত দেশের লোকেরা অধ্যয়ন করছেন, জিজ্ঞাসা করছেন। প্রতি দশকে আমরা একসঙ্গে বসে ভাবনাচিন্তা করি যে, শাখার দ্বিতীয় কোনো বিকল্প আছে কি? এরকম চিন্তনবৈঠকে আমি নিজে ৬/৭ বার উপস্থিত থেকেছি। কিন্তু আমাদের যা করণীয়, সেই কাজের এমন কোনো বিকল্প এখনো পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি।

□ সঙ্ঘ বনবাসী ক্ষেত্রে কীভাবে বেড়ে চলেছে?

● বনবাসী ক্ষেত্রে প্রথম কাজ হলো জনজাতি বন্ধুদের সশক্ত করা। তাদের সেবা করা। ধীরে ধীরে যুক্ত করা হয়েছে তাদের কল্যাণকর দিকগুলিকে রক্ষা করার পরিকল্পনা। আমরা চাই জনজাতি সমাজ থেকেই তাদের নেতৃত্ব উঠে আসুক, যাতে তাঁরা নিজেদের চিন্তা নিজেরাই করতে পারেন এবং তারাও এই রাষ্ট্রজীবনের অভিন্ন অঙ্গ এই বোধ জাগ্রত হয়। এই ক্ষেত্রে কাজ করা স্বয়ংসেবকের সংখ্যাও বাড়ছে। জনজাতি কারা? তাদের মূল কোথায়,

জনজাতি সমাজের মহাপুরুষ, স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী বীরযোদ্ধা—এইসব বিষয়ে তাদের শিক্ষিত করে ধীরে ধীরে রাষ্ট্রচেতনাসম্পন্ন কার্যকর্তা ও নেতৃত্ব খাড়া হোক, তার প্রয়াস চলছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে সঙ্গে অন্য জনজাতি ক্ষেত্রেও সঙ্ঘের শাখা বেড়ে চলেছে।

□ ভারতের প্রতিবেশী দেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার চলছে, তাদের উপর আক্রমণ চলছে। বিশ্বে মানবাধিকার নিয়ে যারা দুশ্চিন্তা করেন, তাঁরা কি হিন্দুদের বিষয়ে চিন্তা করছেন? সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভায় এই বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। এবিষয়ে আপনার অভিমত কী?

● হিন্দুদের জন্য উদ্বেগ তখনই সমাপ্ত হবে যখন হিন্দু সমাজ প্রবল শক্তিশালী হবে। হিন্দু সমাজ এবং ভারত পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত রয়েছে। হিন্দু সমাজের খুব ভালো স্বরূপ ভারতকেও খুব ভালো দেশ হিসেবে তৈরি করবে। ভারতে যারা নিজেকে হিন্দু বলেন না, তখন তাদেরও সঙ্গে নিয়ে চলতে পারবে। কেননা তারা এক সময় হিন্দুই ছিলেন। ভারতের হিন্দু সমাজ শক্তিশালী হলে সারা বিশ্বের হিন্দুরা আপনা থেকেই লাভবান হবে। এই কাজ চলছে কিন্তু এখনো পূর্ণ হয়নি। ধীরে ধীরে সেই স্থিতি আসছে। বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ এবারে যত দেখা গিয়েছে, আগে তা কখনো দেখা যায়নি। শুধু এটুকুই নয়, বাংলাদেশের হিন্দুরা বলেছেন, তারা পালিয়ে যাবেন না, এখানে থেকেই তারা তাদের অধিকার আদায় করে নেবেন। এখন হিন্দু সমাজের মানসিক শক্তি বেড়েছে। এটা একদিকে সংগঠনের শক্তি। তার পরিণাম আপনা থেকেই এসে যাবে। এর জন্য আরও লড়াই

“একদিন আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে দেখে পৃথিবীর অন্যান্য দেশও তাদের নিজের নিজের দেশের মতো করে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ স্থাপন করবে। যার ফলে সমগ্র বিশ্বের জীবনবোধে পরিবর্তন আসবে। এই প্রক্রিয়া ২০৪৭ সালের পর শুরু হবে এবং তা পূর্ণ হতে ১০০ বছর লাগবে না। আগামী ২৫-৩০ বছরের মধ্যেই পূর্ণ হয়ে যাবে।”

করতে হবে। বিশ্বের যেখানে যেখানে হিন্দুরা আছেন, তাদের জন্য সংগঠন হিসেবে, নিজেদের মর্যাদার মধ্যে থেকে যা যা করা যায়, তা সবকিছু করা হবে। এর জন্যেই সঙ্ঘ। স্বয়ংসেবকদের প্রতিজ্ঞাই হলো ধর্ম, সংস্কৃতি ও হিন্দু সমাজের সংরক্ষণ করে রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করা।

□ বিশ্ব পরিস্থিতিতে সামরিক শক্তি, রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা এবং আর্থিক শক্তির একটি নিজস্ব গুরুত্ব রয়েছে। সঙ্ঘের এবিষয়ে কীরকম ভাবনাচিন্তা?

● শক্তিশালী হতেই হবে। সঙ্ঘের প্রার্থনাতেই আছে— ‘অজয্যাং চ বিশ্বস্য দেহীশ শক্তিং’---বিশ্বের অজেয় শক্তি আমাদের দাও। নিজস্ব শক্তিই প্রকৃত শক্তি। সুরক্ষার বিষয়ে আমরা যেন কারও উপর নির্ভরশীল না থাকি, নিজেদের সুরক্ষা যেন নিজেরাই করতে পারি, আমাদের যেন কেউ পরাজিত না করতে পারে। সারা বিশ্ব মিলেও যেন আমাদের পরাজিত না করতে পারে—এমন শক্তিশালী আমাদের হতেই হবে। কেননা এই পৃথিবীতে কিছু দুষ্ট শক্তি আছে যাদের স্বভাবই অন্যকে আক্রমণ করা। ভালো মানুষরা কেবল ভালো হওয়ার কারণে সুরক্ষিত থাকতে পারেন না। ভালোর সঙ্গে সঙ্গে শক্তিরও প্রয়োজন। কেবল ব্যক্তিগত শক্তি লক্ষ্যহীন হলে হিংসার কারণ হতে পারে। এজন্য তার সঙ্গেই ভালোত্বও প্রয়োজন। এই দুইয়ের সাধনা আমাদের করতে হবে যাতে ভারতবর্ষ অজেয় হয়। ‘পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্’--- এমন শক্তিশালী হতে হবে। যখন কোনো উপায় থাকবে না, তখন শক্তি প্রয়োগ করে দুষ্ট শক্তিকে দমন করতেই হবে। শক্তির সঙ্গে সঙ্গে যদি সজ্জনতা থাকে, তবেই রাবণকে বিনাশ করে ওই স্থানে বিভীষণকে রাজা বানিয়ে ফিরে আসা যাবে। এসব কারণে বিশ্বপরিদৃশ্যে আমাদের প্রভাব বৃদ্ধি হবে---এজন্য আমরা করছি না। সকলে যেন সুস্থ থাকে, সক্ষম হয়, এজন্য করছি। আমাদের শক্তিশালী হতেই হবে, কেননা দুষ্টশক্তির আক্রমণ আমরা আমাদের সব সীমান্তেই ভোগ করছি।

□ ভারতের ভাষাগত, সংস্কৃতিগত ও ধর্মীয় বিবিধতা সত্ত্বেও সঙ্ঘের কাজ কীভাবে বেড়ে চলেছে?

● সঙ্ঘের মধ্যে এসে দেখতে হবে। সব ভাষার, সব মত-পথ-

সম্প্রদায়ের মানুষ খুব আনন্দের সঙ্গে মিলেমিশে সঙ্ঘের কাজ করে থাকেন। সঙ্ঘের গান কেবল হিন্দিভাষায় নেই। ভারতের সমস্ত ভাষাতেই আছে। প্রত্যেক ভাষায় সঙ্ঘ গানের গায়ক, রচনাকার, কবি আছেন। তা সত্ত্বেও সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে যে তিনটি গান নির্দিষ্ট করা হয়, তা ভারতবর্ষের সর্বত্র গাওয়া হয়। সবাই নিজের নিজের বৈশিষ্ট্যে অটুট থেকে রাষ্ট্রীয়তার সম্মান এবং একাত্মতার ভাবনাকে রক্ষা করে চলেন—এটাই সঙ্ঘ। এত বিবিধতায় ভরপুর সমাজকে একসূত্রে গাঁথার সূত্র আমরাই দিয়ে থাকি।

□ সঙ্ঘ সামাজিক সমরসতার কথা বলে এবং তার জন্য কাজও করে। কিন্তু কিছু মানুষ রয়েছেন যারা সমানতার কথা বলে থাকেন। আপনি এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্যকে কীভাবে দেখছেন?

> **হিন্দু সমাজের খুব ভালো স্বরূপ ভারতকেও খুব ভালো দেশ হিসেবে তৈরি করবে। ভারতে যারা নিজেকে হিন্দু বলেন না, তখন তাদেরও সঙ্গে নিয়ে চলতে পারবে। কেননা তারা এক সময় হিন্দুই ছিলেন। ভারতের হিন্দু সমাজ শক্তিশালী হলে সারা বিশ্বের হিন্দুরা আপনা থেকেই লাভবান হবে।**

● আর্থিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক—এই রকমেরই সমানতা আসা চাই। নতুবা এর কোনো অর্থ নেই। বন্ধুত্বভাবই সমরসতা। স্বাধীনতা ও সমতা দুইয়েরই ভিত্তি হলো বন্ধুত্ব। সমতা ব্যতীত স্বাধীনতায় কুণ্ঠা থাকে। স্বাধীনতা স্থায়ী করতে হয় তো বন্ধুত্বকে ভিত্তি করতে হবে। এই বন্ধুভাবকেই সমরসতা বলা হয়। সমতার একটি পূর্বশর্ত রয়েছে। জাতপাত ও অস্পৃশ্যতার বিরোধিতায় আইন করার পরেও বৈষম্য দূর হয় না। কেননা তা মন-মস্তিষ্কের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। তা আগে দূর করতে হবে। সবাই আমার আপন, এজন্য সবাই সমান—এই বোধ থাকা চাই। বাহ্যত সমান না হলেও আমরা একে অন্যের জন্য আছি, আত্মীয়তায় বাঁধা আছি—একেই সমরসতা বলা হয়। প্রেমভাব, বন্ধুভাবকেই সমরসতা বলা হয়।

□ সঙ্ঘে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিয়ে প্রায়ই প্রশ্ন ওঠে। এবিষয়ে আপনি কী বলেন?

● সঙ্ঘের প্রথম দিকে ১৯৩৩ সালের আশেপাশে ব্যবস্থা তৈরি হয় যে মহিলাদের মধ্যে ব্যক্তি নির্মাণ ও সমাজ গঠনের কাজ রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির দ্বারা হবে। সেই ব্যবস্থাই চলছে। যখন রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি বলবে, সঙ্ঘও মহিলাদের মধ্যে এই কাজ করুক, তখন আমরা তাদের মধ্যে কাজ করবো। দ্বিতীয় কথা হলো, সঙ্ঘের শাখা শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য। সেই কার্যক্রম দেখার জন্য মহিলারা আসতে পারেন এবং আসেনও। কিন্তু সঙ্ঘের কাজ কেবল কার্যকর্তাদের ভরসায় চলে না। আমাদের মা-বোনেরা সহযোগিতা করেন, তবেই সঙ্ঘের কাজ চলে। স্বয়ংসেবকদের বাড়িতে যত মহিলা আছেন, তাঁরা সবাই সঙ্ঘেরই। বিভিন্ন সংগঠনেও মহিলারা স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করছেন। সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভায় মহিলাদেরও প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ রয়েছে। মহিলারাই ভারতের মহিলাদের জন্য প্রথম ব্যাপক সমীক্ষা করেছেন, আর সরকারও তা গ্রহণ করেছে। তাঁদের দ্বারাই গত বছর সারা দেশে অনেক বড়ো মহিলা সম্মেলন হয়েছে, তাতে লক্ষ লক্ষ মহিলা অংশগ্রহণ করেছিলেন। এসব কাজে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সমর্থন ও সহযোগিতা রয়েছে। আমরা মনে করি মহিলাদের উন্নতি পুরুষরা করতে পারবেন না। মহিলাদেরই মহিলাদের উন্নতি করতে হবে, আর তাতেই সকলের উন্নতি হবে। এজন্য আমরা এবিষয়কেই প্রাধান্য দিই এবং তাঁরা যা করতে চান তার জন্য তাদের সহযোগিতা করি।

□ সঙ্ঘের শতবর্ষে পঞ্চ পরিবর্তনের সংকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এজন্য পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। এর ভিত্তিতে আগামীদিনে কী করা যেতে পারে?

● আচরণের পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় কথা হলো মনের ভাব। যে কাজ করার ফলে মনের ভাব পরিবর্তন হয়, স্বভাব বদল হয়, সেরকম কাজ দেওয়া। এতে জীবনের দিশাও ঠিক হয়ে যায়। এজন্যই পঞ্চ পরিবর্তনের প্রসঙ্গ। সমরসতার জন্য নিজ সমাজের প্রতি আত্মীয়তার ভাব উৎপন্ন হোক। নানাপ্রকারের সমস্যা রয়েছে, নানান ব্যবস্থা রয়েছে, নানা ভৌগোলিক ক্ষেত্র, তাতে নানা সমস্যা রয়েছে। তার সমাধানের জন্য কোনো একটিমাত্র নিয়ম—এটা ঠিক নয়। এত বড়ো আমাদের দেশ, তার সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যবস্থা করতে হয়, আর সে ব্যবস্থা যদি মন থেকে সায় দেয় তবে তা কল্যাণকর হবে এবং ভালোবাসাও বাড়বে। সামাজিক সমরসতা আনার জন্য কোনো প্রচার নয়। সমাজের বাইরে যারা আছেন, তাদেরও আমরা এক মনে করি। সমস্ত শ্রেণীর মানুষ আমাদের বন্ধু হওয়া চাই, সবাই আমার আত্মীয়-বন্ধু হওয়া চাই। যেখানে এই ভাব বলবতী, সেখানে মন্দির, জল, শ্মশান সকলের জন্য ব্যবহারের হোক—এ থেকে শুরু করতে হবে, একে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

এরকমই পরিবার প্রবোধনের বিষয়। যা পরিবারের পক্ষে মঙ্গলজনক, যা পরম্পরাগত সংস্কার থেকে এসেছে, সেই কুলাচার ও দেশাচারকে মান্যতা করা উচিত। সেই বিষয়ে আলোচনা করে সহমতের ভিত্তিতে পরিবারের সদস্যদের তা আচরণের মধ্যে আনতে হবে। এটাই পরিবার প্রবোধন।

পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন আন্দোলন-সহ নানা বিষয়

চলছে। নিজের ঘরে জলের অপচয় হচ্ছে, তার জন্য সচেতন থাকতে হবে। নিজের থেকে শুরু করতে হবে। গাছ লাগাও, প্লাস্টিক হঠাও, জল বাঁচাও—এসব করার ফলে সচেতনতা বৃদ্ধি হবে। এরকমই 'স্ব'-এর ভিত্তিতে চলতে হবে। নিজের জীবনে, ব্যবহারে তা আনতে হবে। আমাদের প্রত্যেকের যে রাষ্ট্রীয় 'স্ব' রয়েছে তার ভিত্তিতে চলতে হবে। নিজের বাড়িতে ভাষা, ভুষা, ভোজন, ভজন ও ভ্রমণ ইত্যাদি 'স্ব'-এর ভিত্তিতে করতে হবে। বাড়ির বাইরে পরিস্থিতি অনুযায়ী চলতে হয়, কিন্তু বাড়ির ভেতরে তো আমরা 'স্ব'-এর ভিত্তিতে চলতে পারি। তাতে আমাদের পরম্পরাগত সংস্কার টিকে থাকবে। দেশকে 'স্ব'-নির্ভর করতে হলে পরিবারের মধ্যে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করতে হবে। এর অভ্যাস করতে হবে। এর অর্থ এই নয় যে দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বন্ধ করতে হবে। বিশ্বঅর্থব্যবস্থায় তা একপ্রকার ভারসাম্য রক্ষা। দেশের হিতের কথা মাথায় রেখে তা চালাতে হবে। দেশের প্রয়োজনীয়, কোনো জীবনদায়ী দ্রব্য দেশের বাইরে থেকে আনার প্রয়োজন পড়লে আনতে হবে। কিন্তু তাতে নিজের মঙ্গলের কথা মাথায় রেখে, কারও চাপে নয়। 'স্ব'-এর আচরণের দ্বারাই এমন মানসিকতা নির্মাণ হবে। আইন, সংবিধান, নাগরিক শিষ্টাচার পালন প্রভৃতি 'স্ব'-এর আচরণের মধ্যেই পড়ে। পঞ্চ পরিবর্তনের বিষয় নিয়ে স্বয়ংসেবকরা সেই পথেই এগিয়ে যাবেন এবং শতাব্দীবর্ষ সমাপ্ত হওয়ার পর শাখার মাধ্যমে এই ভাবনা সমাজের মধ্যে নিয়ে যাবেন। এটা নিজের আচরণের মধ্যে এলে একটা পরিবেশ নির্মাণ হবে। আর পরিবেশ নির্মাণ হলে সমাজে পরিবর্তন আসবে। আরও অনেক বিষয় আছে, তাও ধীরে ধীরে শুরু হবে। আমরা এরকম ভেবেছি, দেখা যাক কী হয়।

□ আগামী ২৫ বছরের জন্য কী সংকল্প গ্রহণ করা হয়েছে?

● সমগ্র হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করা এবং দেশকে পরমবৈভবশালী করা। এরপরেও একটি অকথিত কথা আছে, তা হলো সম্পূর্ণ বিশ্বকে এরকমই তৈরি করা। ডাঃ হেডগেওয়ারের সময় থেকেই এই দৃষ্টিভঙ্গি চলে আসছে। তিনি ১৯২০ সালে 'ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা আমাদের লক্ষ্য' এবং 'স্বাধীন ভারত বিশ্বকে পুঁজিবাদের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করবে'—এরকম প্রস্তাব জাতীয় কংগ্রেসে রেখেছিলেন।

□ এবছর সঙ্ঘের শতবর্ষ এবং ২০৪৭ সালে দেশের স্বাধীনতার শতবর্ষ পূর্ণ হবে। তো ভারত বিশ্বগুরু কীভাবে হবে? রাষ্ট্রবিরোধী শক্তি বিভিন্ন প্রকারের বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করবে। এসব আপনি কীভাবে দেখছেন?

● আমাদের যা পদ্ধতি তাতে সমস্ত বিষয়েই চিন্তা করা হয়েছে। আত্মবিস্মৃতি, স্বার্থপরতা ও ভেদভাব—এই বিষয়ের সঙ্গে লড়াই করতে করতেই আমরা এগিয়ে চলেছি আর সমাজের বিশ্বাসও অর্জন করেছি। এই প্রক্রিয়া আগামীদিনেও চলবে। আত্মীয়তার ভিত্তিতে সমাজের সমস্ত মানুষ এক মানসিকতা সম্পন্ন হয়ে যাবেন। তখন এক আর একে মিলে দুই হয়ে যাওয়ার জায়গায় এগারো হয়ে যাবে এবং তা চলতে থাকবে। ভারতবর্ষকে সংগঠিত ও শক্তিশালী করার কাজ ২০৪৭ পর্যন্ত সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে যাবে এবং চলতে থাকবে। বিশ্ব জীবনে সমরস ও শক্তিশালী ভারতের প্রভাবী যোগদান দেখে সমস্ত মানুষ সেই উদাহরণকে সামনে রেখে এগিয়ে যাবেন। ১৯৯২ সালে আমাদের এক প্রবীণ কার্যকর্তা বলেছিলেন, 'একদিন আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে দেখে পৃথিবীর অন্যান্য দেশও তাদের নিজের নিজের দেশের মতো করে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ স্থাপন করবে। যার ফলে সমগ্র বিশ্বের জীবনবোধে পরিবর্তন আসবে।' এই প্রক্রিয়া ২০৪৭ সালের পর শুরু হবে এবং তা পূর্ণ হতে ১০০ বছর লাগবে না। আগামী ২৫-৩০ বছরের মধ্যেই পূর্ণ হয়ে যাবে।

□ শতাব্দীবর্ষে হিন্দুহিতৈষী, সঙ্ঘের শুভানুধ্যায়ী এবং এই রাষ্ট্রের শুভচিন্তক যাঁরা আছেন, তাঁদের জন্য আপনার বার্তা কী?

● হিন্দু সমাজকে এখন জাগ্রত হতেই হবে। নিজেদের সমস্ত ভেদাভেদ, স্বার্থপরতার ঊর্ধ্বে উঠে হিন্দুত্বের শাশ্বত মূল্যবোধের ভিত্তিতে নিজেদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও পেশাগত জীবন রচনা করে শক্তিশালী, নীতিনিষ্ঠ এবং সর্বপ্রকারের বৈভব সম্পন্ন ভারতও নির্মাণ করতে হবে। কেননা সমগ্র বিশ্ব নতুন পথের প্রতীক্ষায় রয়েছে। সেই পথ দেখানোর ঈশ্বরপ্রদত্ত কর্তব্য ভারতের হিন্দু সমাজের উপরেই পড়েছে। কৃষিবিপ্লব হয়ে গিয়েছে। শিল্প-বিপ্লব হয়ে গিয়েছে। বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি বিপ্লব হয়ে গিয়েছে। এখন ধর্ম বিপ্লবের প্রয়োজন। আমি রিলিজিয়নের কথা বলছি না। সত্য, শুচিতা, করুণা ও তপস্যার ভিত্তিতে মানবজীবনের পুনর্রচনা হোক। সারা বিশ্বের এটি চাহিদা এবং ভারত তার পথ প্রদর্শক—এটি অপরিহার্য। সঙ্ঘকাজের গুরুত্বকে অনুভব করে 'আমি ও আমার পরিবার'—এই ভাবনার ঊর্ধ্বে উঠে, নিজের জীবনে উদাহরণ সৃষ্টি করে, সক্রিয় হয়ে সকলকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে—এটিই আজ প্রয়োজন। ▮

হিন্দু সমাজকে এখন জাগ্রত হতেই হবে। নিজেদের সমস্ত ভেদাভেদ, স্বার্থপরতার ঊর্ধ্বে উঠে হিন্দুত্বের শাশ্বত মূল্যবোধের ভিত্তিতে নিজেদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও পেশাগত জীবন রচনা করে শক্তিশালী, নীতিনিষ্ঠ এবং সর্বপ্রকারের বৈভব সম্পন্ন ভারতও নির্মাণ করতে হবে। কেননা সমগ্র বিশ্ব নতুন পথের প্রতীক্ষায় রয়েছে। সেই পথ দেখানোর ঈশ্বরপ্রদত্ত কর্তব্য ভারতের হিন্দু সমাজের উপরেই পড়েছে।

গল্পকথায় ডাক্তারজী

(১৯)

শ্রদ্ধা সাহস ও কর্তব্য

মৌলবি লিয়াকত হুসেন দেশপ্রেমের নিরিখে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিলেন এক ব্যতিক্রমী মানুষ। ষাটোর্ধ্ব এই ব্যক্তির নিখাদ দেশভক্তি ছিল উল্লেখনীয়। তার গভীর অধ্যবসায় ও কর্মক্ষমতা তরুণদের কাছেও ছিল অনুকরণীয়। তিনি লোকমান্য তিলকের খুব ভক্ত ছিলেন। দরিদ্র মানুষের জন্য অর্থ সংগ্রহ, গরিব ছাত্রদের জন্য বই, স্কুলে বেতনের ব্যবস্থা করা তার ছিল নিত্য কাজের মধ্যে। অর্থ সংগ্রহ করে স্বদেশীভাব জাগরণে প্রভাতফেরি, স্বাদেশিকতা, সভা ইত্যাদির ব্যবস্থা তিনি করতেন। নিজের জীবনযাপন ছিল অত্যন্ত সাদামাটা। 'কুবের বস্তু ভাণ্ডার' নামে তিনি একটি স্বদেশী দ্রব্যের দোকান খুলেছিলেন। তাঁর এই মহৎ কাজে কেশব ও তার কয়েকজন বন্ধু সর্বদা সহযোগী থাকতেন। এই মৌলবি স্বদেশী ব্রত পালনে এক সময় শোভাযাত্রায় তুর্কি টুপি ছেড়ে গৈরিক পতাকা নিয়ে যাওয়া শুরু করেন (ডাঃ যাদব রাও বর্ণিত স্মৃতি কথা থেকে)। ডাঃ কেশব হেডগেওয়ার তার প্রতি ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। মৌলবি লিয়াকত হুসেন একবার অসুস্থ হলে কেশবরাও তার পরিপূর্ণ সেবা-শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তোলেন।

একবার এই দেশভক্ত মানুষটির সভাপতিত্বে একটি সভা হচ্ছিল। বিষয় অবশ্যই স্বাদেশিকতা। কিন্তু হঠাৎ জনৈক বক্তা তার কথার মধ্যে লোকমান্য তিলক সম্পর্কে কিছু অনভিপ্রেত কথা বলে ফেলে, তার কথা শুনে মঞ্চে সভাপতির আসনে বসা লিয়াকত হুসেনও খুব বিব্রত বোধ করছিলেন। কিন্তু ওরকম কথা শোনামাত্র কেশবরাও ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠে দাঁড়ান আর তৎক্ষণাৎ ওই জনাকীর্ণ সভা মঞ্চে উঠে সেই বক্তার গালে সপাটে এক চড় কষিয়ে দেন। এ ছিল সেই বক্তার সামান্যমাত্রায় বোধের শিক্ষা। নিজের সম্পর্কেও তিনি খুব সতর্ক থাকতেন। একবার লিয়াকত হুসেনের প্রভাতফেরিতে কেশবরাও পতাকা হাতে সবার আগে চলার সময় হঠাৎ এক পুলিশ অফিসার কাছে এসে তাঁকে মারাঠিতে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। কেশব রাওয়ের কাছে এটা খুব আশ্চর্যের বিষয় ছিল যে ওই অফিসার কী করে জানলো যে সে মহারাষ্ট্রের। পরে বুঝলেন তার মাথার লম্বা শিখাটি ছিল মহারাষ্ট্রের চিহ্ন। অবিলম্বে তিনি সেটি ছোটো করে ফেললেন। বৃহত্তর স্বার্থে ক্ষুদ্রের, নিজের ভালো-মন্দের সমর্পণ; এটাই ছিল কেশবরাও হেডগেওয়ারের সংগঠন সূত্র।

(২০)

ভক্তি ও শক্তি

এ তো চিরন্তন সত্য যে শুধু ভক্তি শ্রদ্ধায় কাজ হয় না, তার প্রয়োগ সাফল্যে শক্তিও প্রয়োজন, যা কেশবরাওয়ের মধ্যে যথেষ্ট মাত্রায় ছিল। অনেক মজার ঘটনার মধ্য দিয়ে কেশবের মধ্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বছর পাঁচেক কেশবরাও কলকাতায় ছিলেন। থাকতেন সেই 'শান্তিনিকেতন লজ'-এ, কিন্তু ভোজন ব্যবস্থা পরিবর্তন হতো অবস্থানুসারে অর্থাৎ আর্থিক অবস্থার উপর। কখনো ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে অন্য ছাত্রাবাসে চলে যেতেন, কখনো ধাবায়, কখনো প্রকৃত নিমন্ত্রণ বা অনুষ্ঠানাদিতে। তখন সস্তার যুগ। কলকাতায় পঁচিশ টাকা হলে মাসের খাওয়া আরামে হয়ে যেত। টাকায় আটসের দুধ, দু-তিন পয়সায় এক ডজন কলা। নাগপুরে ব্যায়ামশালার নিত্য কসরত কেশব এখানে পুরোপুরি অভ্যাসে রেখেছিল। বিরাট বুকের পাটা, পেশিবহুল বাহুযুগল, বৃষস্কন্ধ যুক্ত চেহারার এক বলিষ্ঠ যুবক। একবারে তিনি বিশ-পঁচিশ খানা রুটি খেতেন। কখনো প্রতিযোগিতা হলে এই সংখ্যা বেড়ে যেত। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন ছিল সেবা ও স্বাদেশিকতার কাজ।

একবার কলেজে ক্লাস হচ্ছিল। অধ্যাপক ক্লাসে আসতে একটু দেরি হওয়ায় যা হয়; তারুণ্য-স্বভাবের কারণে ছাত্র বন্ধুরা সব হাসি ঠাট্টায় মশগুল হয়ে উঠল। এই হাসি ঠাট্টার মধ্যে কেশব রাওয়ের বন্ধু হাওড়ার ডাঃ অমূল্য রতন ঘোষ হঠাৎ এক প্রতিযোগিতায় উৎসুক হয়ে ওঠে— কে কত হাতের ঘুষি সহ্য করতে পারে। বলেই সে জামার আস্তিন গুটিয়ে এগিয়ে এল। কেশবরাও তখন হাসতে হাসতে বলল— ঠিক আছে তুমি আগে আমাকে মেরে দেখাও কটা ঘুষি মারতে পার। কেশবরাওয়ের হাতের পেশীর উপরে ঘুষির বর্ষণ শুরু হলো। সমস্ত ছাত্র এই প্রতিযোগিতা উপভোগ করতে তখন দুজনকে ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়ল। অমূল্য রতনের মুহুর্মুহু মুষ্টি প্রহারে কেশবের মুখে কোনো কষ্টের চিহ্ন দেখা গেল না। শেষে মারতে মারতে এক সময় সে হাঁপিয়ে উঠলো। ক্লান্ত হয়ে হসে পড়ল। পরবর্তীকালে এই ঘটনার উল্লেখ করে ইংরেজি মর্ডান রিভিউ পত্রিকায় ডাঃ অমূল্য রতন ঘোষ লিখেছেন— "হেডগেওয়ার এক ইঞ্চিও পেছনে সরেনি। আমি তাকে হারাতে গিয়ে নিজেই হেরে গেলাম।" □